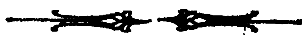
মহাত্মা গান্ধীর

জীবন-চরিত



শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বি, এল,

উকীল, বাঁকুড়া, জাতীয় স্বাবলম্বন সমিতির রচয়িতা

কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বাঁকুড়া হইতে

প্রকাশিত।

মূল্য ৵০ আনা।

শ্রীশিশিরকুমার বসু কর্ত্তৃক
শিশির প্রেস হইতে মুদ্রিত,
৫৯নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

বহু যত্নে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। রচনাতে ত্রুটি থাকিলেও, বিষয়টী পবিত্র। এই জন্য এই গ্রন্থখানি আমি সোৎসাহে আমার স্বর্গগত পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া জননীর পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

বিনীত সন্তান—

বৈদ্যনাথ।

ভূমিকা।

দেশ অধঃপতিত হইলেও, যতদিন মানব মহাপুরুষগণের পূজা করে, ততদিন দেশের পুনরুত্থানের আশা বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যহ মহাত্মগণের বিষয় চিন্তা করা, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে সাধারণ মানবের প্রাণেও ক্রমশঃ নিঃস্বার্থপরতা, স্বদেশ-প্রেমিকতা এবং সাধুজীবনের অন্যান্য সদ্‌গুণরাজি ফুটিয়া উঠে। মানব পরার্থপরতা গুণ অর্জ্জন করিলে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত হয়। এই পরার্থপরতা প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে বহু মহাত্মার উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগেও ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীজিই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। দেশের উন্নতি-কল্পে গান্ধীজি যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিলেও, মন হইতে স্বার্থের কলঙ্ক বিদূরিত হয়। ইঁহার পবিত্র জীবনী প্রত্যেক ভারতবাসীর পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য।

দেশের জন-সাধারণ যাহাতে পবিত্র গান্ধী-চরিত্র সহজে জ্ঞাত হইবার সুযোগ পায়, তদুদ্দেশে অতি সরল ভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছি। পরমেশ্বরের কৃপায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সুখের বিষয় হইবে।

এই গ্রন্থ রচনায় মান্দ্রাজ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত একখানি 'গান্ধী-জীবনী' হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

গ্রন্থখানি লিখিত হইবার পর আমার পুত্র শ্রীমান্ গৌরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ছাপাখানার ব্যবহারের জন্য ইহার একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত

করিয়া দিয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য সে একটি কবিতাও লিখিয়া দিয়াছে। ইহাতে কতকটা আনন্দিত হইয়াছি। মুদ্রাঙ্কণ কালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় বি, এ, কলিকাতায় অবস্থান করিয়া মুদ্রিত পত্রিকাগুলি সযত্নে সংশোধন করিয়া দেওয়ায় অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি কয়েকটি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। আমি তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি:—বাঁকুড়ার বাবু গোপীনাথ দত্ত, ঝাবড়চাঁদ চতুরদাসপক্ষে শ্রীগোবিন্দ জী, নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু, নলিনচন্দ্র মাঝি, বাবু হরেকিষণ রাঠি, দ্বারকাদাস ফুলচাঁদ, নর্ম্মল শিউবকস, গোলোক চন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র নাগ, রাজগ্রামের বিপিনবিহারি দত্ত, কলিাতার প্রোফেসার রজনীকান্ত দে, কবিরাজ গিরিজা প্রসন্ন সেন, বাবু হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, এবং 'কমলালয়ের' বাবু খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা ব্যতীত আরও অনেকে সহানুভূতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। ইতি—

কলিকাতা,
১৭ই মে, ১৯২৫ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধী বরণ

পর দুঃখে দুঃখী হৃদয় যাঁহার
সরল যাঁহার প্রাণ।
তোলে গো যাঁহার প্রেমের পাথার
মৃদু রবে কলতান॥
হৃদয় যাঁহার, ভরা মমতায়,
পরদুঃখে মন গলে;
নিয়োজিত কাম, হিত সাধনায়,
জাগে নিতি নব বলে॥
আর্ত্তের সেবা লক্ষ্য যাঁহার
তুচ্ছ বিভব সুখ।
উন্নত চিত্ত ঊর্দ্ধ উদার
সহজ লাস্য মুখ॥
প্রেম রাগে রাঙ্গা কর্ম্মের ধারা
স্নিগ্ধ আলোকে উজলে।
অসীম আকাশে দীপ্তি বিকাশে,
প্রীতি হাসে ধরাতলে॥
সেই সে মহান্ জাতির আত্মা
আজি গো মোদের দ্বারে।
চল সবে চল সাজাই তাঁহারে
ভক্তি কুসুম হারে॥

বিনীত—
গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থকারের পুত্র।

মহাত্মা গান্ধী



প্রথম পরিচ্ছেদ



ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগণের প্রদীপ্ত দিনমণি গান্ধী অতি অল্প সময়ের মধ্যে একত্রিশ কোটি মানবের উপরে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র দেহ, নিঃস্ব গান্ধী একক পৃথিবীর প্রবলতম শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ভারতবাসীকে তাঁহার অসহযোগ-পতাকা তলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সে আহ্বান এতই মর্ম্মস্পর্শী যে ভারতবাসী তাহার পরাধীনতার কথা বিস্মৃত হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে গান্ধীর পশ্চাতে ছুটিয়াছিল। গান্ধীজীর চরিত্র-বলই তাঁহার অপরিসীম শক্তির কারণ স্বরূপ। বাল্যাবধি তিনি মানবকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পৃথিবীর যে কোন অংশের মানব গান্ধীর বন্ধু ও ভ্রাতা। সমগ্র মানব-জাতির প্রতি তাঁহার এই স্নেহই তাঁহার চরিত্র-বলের ভিত্তি-স্বরূপ। তিনি বুঝিয়াছিলেন মানবের দেহকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু

মানবের আত্মাকে কেহই কখন শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। তাই তিনি বহুদিনের সুপ্ত ভারতের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। গান্ধীজির আন্দোলন সফল হইয়াছে; তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। সুপ্ত ভারত জাগ্রত হইয়া আবার আত্ম-শক্তি অনুভব করিয়াছে, এবং আত্ম-শক্তির পূর্ণ স্ফুরণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

কর্ম্মই গান্ধীজির জীবনের মূল সূত্র। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, কর্ম্ম দ্বারাই ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতীয় জীবনে আত্ম-শক্তির বিকাশ হয়। আত্ম-শক্তির বিকাশ হইলে, মানব, পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া, অনায়াসে মনুষ্যত্বের পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয়। গান্ধীজি জীবনের প্রারম্ভ হইতে নিজকে কর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহ পোরাবন্দরের রাণার দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পিতার অতুল বিভবরাশির সাহায্যে, কোন কর্ম্ম না করিয়া, চির-জীবন সুখের ক্রোড়েই অতিবাহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু সুখ তাঁহার ভাল লাগে নাই। ধন-সম্পত্তি তাঁহার মনকে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি অল্প বয়সেই. জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া, একাগ্র-চিত্তে দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশ-বাসী অনশন-ক্লিষ্ট, তাঁহার পুণ্যময় ভারত অধঃপতিত। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তরায় স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পদ-দলিত করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় দৈন্য ও দুঃখকে জীবনের চির-সহচর করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উন্নতি কল্পে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল বিচার করিবার এখনও সময় আসে নাই, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা গান্ধীজি যে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন সেরূপ মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয় না।

গান্ধীজির বিশেষত্ব এই যে তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্মই স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয় নাই। স্বার্থের ছায়া পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়কে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি নিজের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে জাতির জীবনে নিমজ্জিত করিয়া কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই স্বার্থ-শূন্যতাই তাঁহার অসাধারণ নির্ভীকতার উৎস স্বরূপ। সকলে তাঁহার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত একমত হইতে না পারিলেও, তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশ-সেবা দেখিয়া, বর্ত্তমান জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, এবং তাঁহাকে মহাত্মা আখ্যা প্রদান করিয়াছে। আমেরিকা প্রদেশের জনৈক মনস্বী ব্যক্তি মহাত্মাজীকে গৌতম বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্টের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে শেষোক্ত মহাপুরুষগণের সহিত সমশ্রেণীতে সংরক্ষিত করিয়াছেন। কলেজ ডি ফ্রান্সের জনৈক অধ্যাপক এ, মার্টিনিউ মহোদয় মহাত্মাজীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে গান্ধীজী জগৎ সমক্ষে যেরূপ প্রবল ইচ্ছা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ ইচ্ছা-শক্তির দৃষ্টান্ত মানব-জাতির ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

মহাত্মাজী সরল ও নিরভিমানী। তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কোন ভ্রম বুঝিতে পারিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে জগতের নিকট প্রকাশ করেন। অসহযোগ প্রবর্ত্তন কালে তাঁহার ধারণা ছিল যে ভারতবাসী অতি সহজে অল্প সময়ের মধ্যেই অহিংসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত এবং সেই মর্ম্মে তিনি ঘোষণাও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতীয়গণ হিংসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য ভারতের অসহযোগ আন্দোলন সুফল প্রসব না করিয়া হিংসা ও ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি এক্ষণে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসহযোগ-নীতি—প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এবং তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ভারতীয় কংগ্রেস অস্থায়ীভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলন আশানুযায়ী ফল সব করে নাই বলিয়া যে এই আন্দোলন কেবলমাত্র হিংসা ও ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। হিংসা সর্ব্ব জাতির মধ্যে সর্ব্বকালেই বিদ্যমান আছে। ভারতবাসীর মধ্যেও যে কোনদিন হিংসা ছিল না এমন নয়। এই হিংসা মানবসমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। গান্ধীজি জগতে এই হিংসার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই অহিংস-আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া মানবের মন হইতে হিংসাকে বিদূরিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে গান্ধীজির পূর্ব্বে কোন মানব হিংসাবৃত্তির বিরুদ্ধে কোন গভীর আন্দোলন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মহাত্মাজীর আন্তরিক যত্ন সত্ত্বেও, ভারতের স্থানে স্থানে হিংসার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি এ জন্য ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত; হিংসা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। প্রেম এবং প্রীতির সাহায্যেই পতিত জাতি ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। গান্ধীজি প্রেম ও প্রীতির উপাসক।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারত হইতে হিংসা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইলেও, ভারতবাসী ইহা দ্বারা অনেকাংশে লাভবান হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। জর্ম্মণ যুদ্ধের পর যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তুরস্কের খলিফার অবমাননায় মুসলমান সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার নানা কারণে আফগানের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সামান্য সংঘর্ষও উপস্থিত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই সময় খিলাফতে যোগ দিয়া সমগ্র ভারতকে তাঁহার পবিত্র অহিংস-পতাকা-তলে সমবেত করিতে না

পারিলে,ভারতে কোন অশান্তির আবির্ভাব হইত কি না তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। অসহযোগ প্রবর্ত্তিত হইবার পর, ভারতের স্থান-বিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার অহিংস আন্দোলনের ফলে ভারতে দেশব্যাপী গুরুতর অশান্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। এরূপ দৃষ্টিতে মহাত্মার আন্দোলন সুফল-প্রসূ।

দ্বিতীয়তঃ, অসহযোগ এখনও ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলেও, ভারতের জনসাধারণের প্রাণে স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। মহাত্মার আন্দোলনের ফলে, ভারতের নিদ্রালস জাতি বহুকালের পর আবার চেতনার স্পন্দন অনুভব করিয়াছে। ভারতীয়গণ পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিতেছে, এবং স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদির প্রতি ক্রমশঃ সকলের প্রীতির উদয় হইতেছে। জাতীয় জীবনের ইহা একটি শুভ লক্ষণ। হিংসা-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া এই নব জাগ্রত জাতিকে ধীর ভাবে বিধি-সঙ্গত উপায়ে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিতে পারিলে, ভারতের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। মহাত্মাজী তাহা অনুভব করিয়াছেন এবং এক্ষণে আইন-অমান্য-সম্বলিত অসহযোগ পন্থা পরিহার করিয়া গঠন-মূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ভারতের আভ্যন্তরীন শক্তি জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক্ষণে রাজনৈতিক চর্চ্চা অপেক্ষা গঠন-মূলক কার্য্যেই অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি সমগ্র দেশে যে বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। সমাজের অধস্তন জাতি সমূহের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, তাহা-দিগকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে হইবে।

২। ভারতের সর্ব্ব-জাতীয় জন-গণের মধ্যে সখ্য ও ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে।

৩। ভারতের লুপ্ত বয়ন-শিল্প উদ্ধারের জন্য চরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতকে পবিত্র খদ্দরে বিভূষিত করিতে হইবে।

মহাত্মাজী বারংবার বলিয়াছেন কেবল চরকার সাহায্যেই ভারতে স্বরাজ আসিবে। তাঁহার এই বাণী অবিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। কারণ চরকা গ্রহণ করিলে, একত্রিশ কোটি ভারতবাসী অল্পসময়ের মধ্যেই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে এবং স্বাবলম্বন-বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা তাহারা যে অমোঘ শক্তি অর্জ্জন করিবে, সেই শক্তিই অদূর ভবিষ্যতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। পরমেশ্বরের কৃপায় মহাত্মাজীর শুভানুষ্ঠান সাফল্য-বিমণ্ডিত হউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গান্ধীর পূর্ণ নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইনি কাথিওয়াড় প্রদেশের একটি প্রাচীন বেনিয়া বংশে ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বণিক বংশ রাজনীতিজ্ঞতার জন্য প্রসিদ্ধ। মহাত্মাজীর পিতৃপুরুষগণ পোরাবন্দর রাজত্বের দেওয়ানের পদে পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তা এবং নির্ভীকতা সকলেরই প্রশংসনীয় ছিল। গান্ধী মহারাজের পিতা পোরাবন্দরে প্রায় ২৫ বৎসর দেওয়ানি করিয়াছিলেন এবং তাহাছাড়া রাজকোট এবং উক্ত প্রদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ-সমূহেরও তিনি দেওয়ান ছিলেন। উক্ত রাজ-সমূহের প্রকৃত মঙ্গলের দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি কাহারও ভয়ে কখন নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। এমন কি পোরাবন্দরের

রাণা মহোদয়েরও কোন কার্য্য তাঁহার চক্ষে দেশের পক্ষে ক্ষতি-জনক বিবেচিত হইলে, তিনি নির্ভীক হৃদয়ে সে কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন, এবং প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল কারণে তিনি অত্যন্ত জন-প্রিয় হইয়াছিলেন, এবং রাণা মহোদয়ও তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইংরাজ বাহাদুরও তাঁহার স্বদেশ-প্রিয়তা ও কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট প্রসিদ্ধ রাজস্থানিক সভাতে তাঁহাকে মেম্বরের পদে মনোনীত করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জননীও অশেষ গুণ-সম্পন্না এবং পবিত্র হৃদয়া রমণী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক বিধান মনোযোগের সহিত পালন করিতেন, এবং একদিকে যেমন হিন্দু দেবদেবীর সেবায় ব্যাপৃতা থাকিতেন, অপরদিকে তেমনি নিজ নারী-জীবনের কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই যত্নবতী থাকিতেন। সন্তান সন্ততিকে তিনি পরম স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেন এবং যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে দেশের কার্য্যে নিজদিগকে নিয়োজিত রাখিয়া দেশবাসীগণের প্রীতি-ভাজন হইতে পারে তজ্জন্য তিনি তাহাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, এবং এই মাতৃভক্ত কনিষ্ঠ পুত্রই জননীর অশেষ গুণরাজি প্রাপ্ত হইয়া, আজ বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার জননীর নিঃস্বার্থ-পরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যেক ধমনীতে চিরদিন প্রবাহিত রহিয়াছে। গান্ধীজি বাল্যকালে, মাত্র কিছুদিনের জন্য কাথিয়াওয়ার প্রদেশের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথিত আছে গান্ধীজীর বিলাত যাইবার প্রস্তাবে তাঁহার জননী অত্যন্ত বাধা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু যখন যাওয়াই স্থির হইল তখন তিনি গান্ধীজীকে

তিনটি সত্যে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। জননীর সন্তোষের নিমিত্ত গান্ধীজী একজন জৈনধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি জীবনে কখনও মদ্য ও মাংস স্পর্শ করিবেন না এবং বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গ উপভোগ করিবেন না। তিনি তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে কখন এই সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। পূর্ণ যৌবনে তিনি লণ্ডন সহরে ছিলেন কিন্তু লণ্ডন সহরের অশেষবিধ প্রলোভনও কখন তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি জননীর পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া জননীর উপদেশ চিরদিন কঠোরভাবে পালন করিয়া আসিতেছেন। গান্ধীজীর সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর, তিনি লণ্ডনেই আইন-বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ভারতে আসিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার—শ্রেণীভুক্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ে তিনি কতক পরিমাণে প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ভারতে থাকিয়া ব্যারিষ্টারি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য তিনি সংসারে প্রেরিত হন নাই। সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে কোন বিরাট উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগৎকে প্রেম ও ভালবাসা শিক্ষা দিবার জন্য, প্রেমের অদ্ভুত শক্তি মানবের নিকট কীর্ত্তন করিবার জন্য, স্বার্থকে মুছিয়া ফেলিয়া কিরূপে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য, মানবের হৃদয়ে স্বার্থের তমোরাশি বিনষ্ট করিয়া প্রজ্ঞার আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য, পতিত জাতির পুনরুদ্ধারের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য, জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞান করিয়া কিরূপে তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য, মহাত্মা গান্ধীর পৃথিবীতে আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের অনুরোধে গান্ধীজিকে একটি জটিল মোকদ্দমার পরিচালনার ভার লইয়া ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিতে হয়। তিনি প্রথমে নেতালে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে ট্রান্সভাল গমন করেন। লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষাকালে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত সকল প্রজাই সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু নেতালে উপস্থিত হইতেই তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হইলেও, তিনি ভারত-বাসী এবং সেই জন্য ইংরাজের সহিত সমান অধিকার তাঁহার নাই। তিনি নেতালের উচ্চ আদালতে ব্যারিষ্টারি করিবার জন্য দরখাস্ত করিলে, তত্রত্য আইন সভার মেম্বরগণ বাধা প্রদান করেন এবং বলেন যে 'রঙ্গিন আদমি' তাহাদের আদালতে ব্যারিষ্টারি করিতে পাইবে, আইনের কখনই এরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বলাই বাহুল্য. এই বাধা প্রদান করিয়া আইন সভার মেম্বরগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র মনেরই পরিচয় দিয়াছিলেন। উক্ত আদালতের জজ মহোদয়গণ কিন্তু উচ্চ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহারা আইন সভার আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া নেতালের সর্ব্বোচ্চ আদালতে গান্ধী মহারাজকে ব্যারিষ্টারি করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থানকালে তত্রত্য ভারতীয়গণের মঙ্গলের জন্য কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষের কার্য্যের ফলে ভারতীয়গণের ও এসিয়াবাসী-গণের অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখিলেই, তিনি নির্ভীকভাবে বাধা প্রদান করিতেন এবং ক্রমশঃ তিনি উপদ্রবহীন বাধাপ্রদানের আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে তাঁহাকে বারংবার কারারুদ্ধ হইয়া ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি দমিত হন নাই।

তাঁহার উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, তথাপি কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এসিয়াবাসী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অধিক সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সত্যপ্রিয়তা, নির্ভীকতা এবং অসাধারণ স্বার্থত্যাগের জন্যই বিশ্বমানবের নিকট আজ মহাপুরুষ বলিয়া সম্পূজিত হইতেছেন।

ইং ১৮৯৪ সালে নেতালে অবস্থিতিকালে তিনি নেতাল ভারতীয় কংগ্রেস'নামক এক মহাসভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু বর্ষ ধরিয়া তিনি এই কংগ্রেসের অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। নেতালের পার্লামেণ্ট মহাসভা "এসিয়াবাসীগণের বহিষ্করণ আইন" নামক একটি আইন প্রণয়ন করেন। গান্ধীজি তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন কিন্তু চুপ করিয়া থাকিয়া অপমান সহ্য করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণকে লইয়া এরূপ তীব্রভাবে উক্ত আইনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করেন যে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইং ১৮৯৫ সালের শেষভাগে মহাত্মাজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নেতাল ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়গণের কষ্টের কথা ভারতের জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া বহুসংখ্যক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাহা ছাড়া একখানি পুস্তিকা লিখিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয়গণকে কিরূপ অসুবিধা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই সংবাদটি বিকৃত আকারে শীঘ্রই দক্ষিণ আফ্রিকাতে উপস্থিত হয়। তথায় প্রচার হইয়া গেল যে ভারতবর্ষে একটি পুস্তিকাতে মুদ্রিত করা

হইয়াছে যে নেতালে ভারতীয়গণের সম্পত্তি লুট করিয়া লওয়া হয়, তাহা-দিগকে অকারণ আক্রমণ করা হয়, এবং পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, এবং তথাপি তাহারা কোন প্রকার প্রতীকার প্রাপ্ত হয় না। এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ গান্ধীজির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা গান্ধীজির কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। ঠিক সেই সময় গান্ধীজি সপরিবারে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত হন। দর্ব্বান বন্দরে আসিয়া তাঁহার জাহাজ নজর করে। তাঁহার আগমন উপলক্ষে এইরূপ রটনা হইয়া যায় যে গান্ধী মহারাজ ভারতবর্ষ হইতে বহুসংখ্যক কারিকর আনয়ন করিয়াছেন এবং তাহারা ইউরোপীয় কারিকরগণের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। ইহার ফলে দর্ব্বানের জনসাধারণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল; এবং দলে দলে বন্দরের নিকট উপস্থিত হইল। জাহাজের কর্তৃপক্ষগণ গান্ধীজিকে দিবাভাগে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গান্ধীজি জনগণকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। তিনি ইউরোপীয়গণের ন্যায়পরায়ণতার উপরে বিশ্বাস রাখিয়া দিবাভাগেই জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বার্থান্ধ ঔপনিবেশকগণ তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব বুঝিল না। মহাত্মাজী জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইবা মাত্র উন্মত্ত জনগণ তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে কঠোরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। দর্ব্বানের পুলিস সাহেবের পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী দূর হইতে গান্ধীজিকে চিনিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া গেলেন এবং নিজের বিপদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া ক্ষিপ্ত জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ত্বরিত-পদে অগ্রসর হইয়া গান্ধীজির পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। এই উন্নতপ্রাণা সাফল্য রূপিণী রমণী নিজের ছাতা খুলিয়া মহাত্মাজীর মস্তকের উপর ধারণ করিলেন এবং নির্ভীক চিত্তে জনগণকে

তীব্র ভৎর্সনা করিয়া কতকটা সরাইয়া দিলেন। তিনি তথা হইতে গান্ধীজিকে সঙ্গে লইয়া একজন ভারতীয় বন্ধুর ভাণ্ডার-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে গান্ধীজি নিরাপদ হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনে শঙ্কা হইল যে তিনি তথায় অবস্থান করিলে, উন্মত্ত-জনগণ হয়ত তাঁহার বন্ধুর ভাণ্ডার গৃহ লুণ্ঠন করিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি তথায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া গান্ধীজি পুলিস কনেষ্টবলের পোষাক পরিধান করিয়া তথা হইতে পলাইয়া গেলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঔপনিবেশিকগণ বুঝিতে পারিল যে তাহাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাহারা দেখিল যে মহাত্মাজী ভারত হইতে কোন কারিকর সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। তখন তাহাদের ক্রোধ প্রশমিত হইল। মহাত্মার প্রতি সাধারণের এই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্র সমূহ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবাসী ইংরাজ রাজের প্রজা। রাজার প্রতি এবং তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রতি প্রত্যেক প্রজার যে কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিলে ভারতবাসী ও সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য প্রজাগণের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতে পাইবে, ইহাই মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোন বিপদে পড়িয়াছে, অমনিই মহাত্মাজী ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সাম্রাজ্যের

সেবা করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রায় সকল কার্য্যেই তিনি দেখাইয়াছেন যে ভারতবাসীগণ কেবল স্বাধিকার দাবী করিতে জানে তাহা নহে, তাহারা সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় দায়িত্বগুলিও গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং সর্ব্বদাই ইচ্ছুক।

ইং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বীর বুয়র জাতি যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুয়র জাতি যখন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া বীর-দর্পে সমরক্ষেত্রে ইংরাজের সম্মুখীন হইল, তখন পরাক্রান্ত ইংরাজের প্রাণেও শঙ্কার উদয় হইল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইংরাজের আসন টলমল করিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী তখন নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া ছিলেন না। তিনি ইংরাজের প্রজা। সুতরাং ইংরাজের প্রতি তাঁহার একটা কর্ত্তব্য আছে তাহা তিনি জানিতেন। তিনি সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ এক সহস্র ভারতবাসীকে লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তৈয়ার করিলেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে আহত ইংরাজ সৈন্যগণকে স্থানান্তরিত করিবেন এবং প্রয়োজন মত আহত সৈন্যগণের জন্য জল ও খাদ্য সামগ্রী যুদ্ধক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া যাইবেন। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন এই এক সহস্র ভারতবাসী সামরিক বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত; ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলে হয়ত সকলেই প্রাণ হারাইবে। এই আশঙ্কায় তাঁহারা গান্ধীজির প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। কিন্তু অবশেষে মহাত্মার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আগ্রহ দেখিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রস্তাবিত সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা উৎফুল্ল অন্তরে নিজ বাহিনী সহ গোলা-গুলি বৃষ্টির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন ও আহত সৈন্যগণের কায়-

মনো বাক্যে সেবা করিতেন। তাঁহার ও স্বেচ্ছাসেবকগণের ধৈর্য্য ও নির্ভীকতা দেখিয়া ইংরাজ স্তম্ভিত হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রে মহাত্মার এই সৎকার্য্যের বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিনি মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাত্মাজী জীবনের সকল কার্য্যই নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ইং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি সপরিবারে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার বিদায় কালে নেতালস্থ ভারতীয়গণ বহুমূল্যবান স্বর্ণনির্ম্মিত থালা, অলঙ্কার এবং অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মাজী ইহার একটিও নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই। সমস্ত উপঢৌকনগুলি সাধারণের উপকারার্থে ব্যয়িত হইবার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বার্থশূন্যতা গুণ দেখিয়া নেতালস্থ ভারতীয়গণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া গান্ধীজী পুনরায় বোম্বাইএ ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে তাঁহার আর শীঘ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরিয়া যাইতে কোন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিডন উদ্যানে বোম্বাইয়ের ওয়াচা মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া সভাপতি মহাশয়ের উপদেশ অনুযায়ী কতকগুলি প্রয়োজনীয় গঠন-মূলক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের পর বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হন যে তাঁহাকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কার্য্য করিবার জন্য অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। বোম্বাইয়ে থাকিয়া ব্যারিষ্টারি করিলে সামান্য আয়াসেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন

কিন্তু তিনি নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় ভাইগণের কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া, তাহাদের স্বার্থের উন্নতি করিবার জন্যই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্বার্থত্যাগই গান্ধীজির মহাজীবনের বিশেষত্ব। ইহার জন্যই তিনি শত্রু মিত্র সকলের নিকটেই পূজিত। গান্ধীজি ব্যারিষ্টারি বন্ধ করিয়া আফ্রিকা গমন করিলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সমাপন করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তত্রত্য ভারতীয়গণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না। তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করায়, গান্ধীজি তাঁহাদের অনুরোধ মত দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়ীভাবে বাস করিবার সংকল্প করিলেন। ট্রান্সভালের সরকার পক্ষ তাঁহাকে তত্রত্য উক্ত আদালতের এটর্নি সংক্রান্তে আইন ব্যবসায় করিবার অনুমতি দেওয়ায় তিনি সে কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এটর্নির কার্য্য করিবার জন্য অধিক সময় পাইতেন না। তাঁহাকে সাধারণের কার্য্যেই প্রায় সকল সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকাস্থ অন্যান্য ভারতীয়গণের সহযোগে তিনি "ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন" নামক এক সমিতি গঠন করেন এবং নিজে ইহার অবৈতনিক সম্পাদকরূপে বহুবর্ষ ধরিয়া কার্য্য করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার একদিন মনে হইল যে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে, এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে হইলে, একটি সংবাদপত্রের প্রচার অবশ্য প্রয়োজনীয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অতি সত্বর "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" নামক একখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এম, এইচ, নজর নামক একজন শিক্ষিত ভারতবাসীকে এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। সংবাদপত্র পরিচালনা করিবার জন্য যে মূল ধনের প্রয়োজন হইল, তাহার অধিকাংশই গান্ধীজি নিজের তহবিল হইতে প্রদান

করিলেন। এই সংবাদপত্রখানি ইংরাজি, গুজরাটি, হিন্দি ও তামিল চারিটি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং গান্ধীজি ইহাকে ফল-প্রসূ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত প্রভূত অর্থ সংবাদ-পত্রটির জন্য অকাতরে ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু অর্থ ব্যয়িত হইলেও, সংবাদ-পত্রটি আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে পারিল না। গান্ধীজি চিন্তিত হইলেন, এবং সংবাদপত্র বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। অবশেষে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার এইরূপ প্রতীতি জন্মিল যে সহরের মধ্যে অবস্থান করিয়া সংবাদ-পত্রটি পরিচালনা করার জন্যই অকারণ বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এবং সেই কারণেই তাঁহারা পুর্ণ-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তিনি বুঝিলেন যে সহরের মধ্যে না থাকিয়া যদি কোন পল্লীগ্রামের মধ্যে ছাপাখানা নির্ম্মাণ-মতে পত্রটি পরিচালনা করা যায়, তবে অকারণ অধিক অর্থ ব্যয়িত হইবে না এবং পরিচালকগণ নিবিষ্ট-চিত্তে নিজ কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার সুযোগ পাইবেন। এইরূপ বুঝিয়া মহাত্মাজী নিজ সঞ্চিত অর্থে দর্ব্বান্ সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ফিনিক্স্ নামক একটি পল্লীতে একশত একর বা কিঞ্চিদধিক ৩০০ তিনশত বিঘা ভূমি ক্রয় করিলেন। ছাপাখানা আদি প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকগুলি উপযুক্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয়গণকে তাঁহার নব-স্থাপিত উপনিবেশে বাস করিবার জন্য গান্ধীজি আহ্বান করিলেন। তথায় বাস করিবার এইরূপ সর্ত্ত স্থির হইল যে যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহারাই উক্ত তিন শত বিঘা ভূমি ও ছাপাখানা দেখাশুনা করিবেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে জীবনে দৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। কেবলমাত্র নিজের ভরণপোষণের জন্য তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক ৪৫৲ টাকা করিয়া খরচ প্রাপ্ত হইবেন, এবং ছাপাখানা ও তিন শত বিঘা

ভূমি হইতে যে লভ্য পাওয়া যাইবে, তাহা তাঁহারা প্রত্যেকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইবেন। আরও সর্ত্ত হইল যে গান্ধীজির সপরিবারে বসবাস করিবার জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। এই গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যে টাকা ব্যয়িত হবে এবং এই ৬ বিঘা ভূমির মূল্যের টাকা গান্ধীজি যখন সক্ষম হইবেন তখন বিনা সুদে পরিশোধ করিবেন। গান্ধীজির নিজ অর্থে প্রতিষ্ঠিত এই নূতন উপনিবেশ ইতিহাসে "ফিনিক্স" উপনিবাস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ফিনিক্সের ঔপনিবেশিকগণ যথারীতি কার্য্য করিয়া সংবাদপত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত করিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আফ্রিকাতে প্রায় দেড়লক্ষ ভারতবাসীর বাস। এই দেড়লক্ষ ভারতবাসীর সন্তান সন্ততিগণের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মহাত্মা গান্ধীকে এই সকল কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কার্য্য পরিচালনার ভার অনেকগুলি লোকের উপর ছিল বটে, কিন্তু মহাত্মাজীই সকল কার্য্যের পরমাত্মা স্বরূপ ছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জোহান্সবার্গে প্লেগের আবির্ভাব হইলে, গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল গঠন করিয়া ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে নিজে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে প্লেগ অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই এবং শীঘ্রই থামিয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে তত্রত্য মিউনিসিপালিটি গান্ধীজীর ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী জীবনে কখন কোন কার্য্য করিতে যান নাই। যে কার্য্যটি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি সে কার্য্যটি জীবনে আনন্দ ও যত্নের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রশংসা বা অপ্রশংসার দিকে লক্ষ্য করিয়া কখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই।

এই খ্রীষ্টাব্দে জোহান্সবার্গের মিউনিসিপালিটির সহিত তত্রত্য ভারতীয় দোকানদারগণের দোকান-গৃহ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং তদুপলক্ষে ভারতীয়গণকে আইনের উপদেশ দিয়া গান্ধীজী প্রভৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে এই সমস্ত অর্থই তিনি সাধারণের কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেতালের বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। তত্রত্য আদিম অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের উপর নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া এই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। গান্ধীজি এবারও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং আহত সৈন্যগণের সেবা করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই বাহিনী প্রায় একমাস ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া আহত সৈন্যগণের অশেষ প্রকার উপকার সাধন করিয়াছিল। বিদ্রোহ শান্ত হইবার পর নেতালের শাসনকর্ত্তা গান্ধীজিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাহিনীর প্রত্যেককেই এক একটি 'মেডেল' উপহার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে গান্ধীজির দৃঢ় ধারণা ছিল যে বিপদের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেবা করিলে, ভারতবাসী অন্যান্য ইংরাজ প্রজার সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে। তিনি মনে করিয়াছিলেন বুয়র যুদ্ধের সময় যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ভারতীয়গণ ইংরাজের উপকার সাধন জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এবং পুনরায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নেতাল বিদ্রোহে যেরূপ কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়াছিল, তাহার ফলে নিশ্চিতই আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়গণকে সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন এবং তাহাদিগকে ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণের সহিত সমান অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদের দুঃখ এবং অসুবিধা বিদূরিত করিবেন। কিন্তু হায়! গান্ধীজির এ আশা পূর্ণ হইল না। সমান অধিকার প্রদান করা দূরের কথা, আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের মনে ভারতীয়গণের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক

হইল না। গবর্ণমেণ্ট এশিয়াবাসীগণের সম্বন্ধে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। এই নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে, গান্ধীজি তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন এই আইনের ফলে আফ্রিকাস্থ ভারতীয়গণের পৌরুষ, আত্মমর্য্যাদা, জাতীয় সম্মান এবং এমন কি ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তত্রত্য ভারতীয়গণের সহিত পরামর্শ মতে যথাসাধ্য পণ করিয়া এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে তীব্র বাধা প্রদান করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা গান্ধী শপথ করিলেন যে তিনি কোন ক্রমেই এই নূতন আইনকে মানিয়া লইবেন না। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য উপদ্রবহীন বাধা প্রদানের নীতি অবলম্বন করিলেন। আফ্রিকাস্থ সমগ্র ভারতীয়গণ, পুরুষ এবং নারী, ধনী ও নির্ধন, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া মহাত্মার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। গান্ধীজি বিলাতে পর্য্যন্ত গমন করিয়া আন্দোলন চালাইলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ নূতন আইন মঞ্জুর করিলেন গান্ধীজি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এই আইনের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা দ্বারা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য গান্ধীজি ভারতীয়গণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ১৯০৭ সালে তাঁহাকে ও তাঁহার বিশিষ্ট সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাদের প্রতি কারাদণ্ডেরও আদেশ হইল। গান্ধীজি যখন শুনিলেন যে তাঁহার সঙ্গীগণকে ছয় মাসের জন্য কঠোর শ্রমের সহিত কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে মাত্র দুই মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড

দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তিনিই এই বাধা প্রদান কার্য্যের নেতা, সুতরাং দণ্ড দিতে হইলে তাঁহাকেই কঠোরতম দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে সেই দণ্ড দেওয়া নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গান্ধীজি ঘৃণায় নতশির হইলেন এবং হেটমুণ্ডে কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সুখের বিষয়, *কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।*

মাত্র ৩ সপ্তাহ পরেই জেনারেল স্মটস্ ভারতীয়গণের সহিত এই ব্যাপারটীর আপোষে মীমাংসার জন্য কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এক প্রকার মীমাংসা শীঘ্রই হইয়া গেল। এই মীমাংসায় স্থির হইল যে প্রথমে কিছুদিনের জন্য ভারতীয়গণকে স্বেচ্ছায় আইন অনুসারে নাম রেজিষ্টারী করিতে হইবে এবং এইরূপ করিলে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই নূতন আইনটি সম্পূর্ণ ভাবে উঠাইয়া দিবেন। জেনারেল স্মাটস্ সাহেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভারতীয়গণ গবর্ণমেণ্টের আফিসে নাম রেজিষ্টারি করাইতে স্বীকৃত হইলেন। গান্ধীজি তাঁহার বাধা প্রদান-মূলক আন্দোলনটী বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই বুঝিতে পারা গেল যে জেনারেল স্মটস্ সাহেবের নিজের প্রতিশ্রুতি ও সর্ত্তমত কার্য্য করিবার আদৌ কোন ইচ্ছা নাই। এ অবস্থায় গান্ধীজি পুনরায় বাধা প্রদান-মূলক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন এই আন্দোলন কালে তিনি দুইবার কারাগারে প্রেরিত হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি দুঃখিত হইলেন না, দেখিয়া কর্তৃপক্ষ গান্ধীজিকে আর স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার সহস্র সহস্র অনুচরবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই সময় ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী কোন কোন ব্যক্তি বিলাতে গমন করিয়া আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যকলাপের বিষয়ে আন্দোলন

করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ইং ১৯১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজির সহিত একটা অস্থায়ীধরণের মীমাংসা করিয়া লইলেন। এই মীমাংসা পাকা হইল না। এমন কি ১৯১২ সালেও কোন স্থায়ী পাকা মীমাংসা হইবার আশা দেখা গেল না। ইতিমধ্যে ভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ও স্বদেশ হিতৈষী স্বর্গীয় মাননীয় গোখেল মহোদয় দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করিয়া ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন। মন্ত্রিগণ স্বীকার করিলেন যে ভারতবাসীর উপর যত পাউণ্ড কর বসান হইয়াছে সেটি তাঁহারা আইন প্রণয়ণ করিয়া উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু গোখেল মহোদয় চলিয়া যাইবার পর গবর্ণমেণ্ট এই কর উঠাইয়া দিলেন না। সেজন্য গান্ধীজি ১৯১৩ সালে পুনরায় তাঁহার বাধা-প্রদান-মূলক আন্দোলন চালাইলেন। এবারের আন্দোলন বড় গুরুতর আকার ধারণ করিল। নেতালে পর্য্যন্ত এই আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র ভারতীয় কুলী ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিল এবং ভারতীয় নারীগণ পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রকাশ্য রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া চলিল। কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। ফলে আফ্রিকাতে এক ভীষণ ব্যাপার সংটিত হইল। সহস্র সহস্র ভারতীয় নর-নারীকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাবদ্ধ করা হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস হইল না। ভারতবর্ষে এই ভয়াবহ সংবাদ আসিয়া পৌছিলে, ভারতের জনগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আন্দোলনকারীগণের সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইতে লাগিল। সুখের বিষয় ভারতের বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই বিপদের সময় ভারতবাসীগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং যাহাতে দক্ষিণ

আফ্রিকাতে ভারতীয়গণ কোন প্রকার কষ্ট না পায়, যাহাতে তাহাদের অসুবিধার কারণ সমূহ দূর করা হয়, তজ্জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনা সমূহের বিশেষ তদন্তের দাবী করিলেন। লর্ড এ্যাম্পথিগের কমিটিও ভারতবাসীর উপর সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। ইহার ফলে বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষ ও জাগ্রত হইলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন। সমস্ত ঘটনার অনুসন্ধান জন্য কমিশন বসিল। এই কমিশন ভারতবাসীগণের অনুকূলে রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। সরকার পক্ষ সেই রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত জেনারেল স্মাট্‌স অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি করিলেন এবং ভবিষ্যতে শাসন প্রণালীর সংস্কার হইবে এবং ভারতীয়গণের দুঃখ বিদূরিত হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি স্থাপিত হইল এবং মহাত্মা গান্ধী তাঁহার উপদ্রবহীন বাধা-প্রদান-মূলক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। সমস্তই হইল বটে, কিন্তু এই ভীষণ আন্দোলনের সময় ভারতের কয়েকটি অমূল্য জীবন নষ্ট হইল। যে মহাপুরুষগণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়-গণের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া অশেষবিধ নিগ্রহ ভোগ করিয়া অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়াছে। এই স্বার্থত্যাগী বীরগণের নাম হারবত সিং, ভালিয়াম্মা, নাগাপ্পাস এবং নারায়ণ স্বামী। পরমেশ্বরের কৃপায় ইহাদের আত্মা স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গান্ধী মাননীয় গোখেল মহোদয়কে নিজ রাজনৈতিক গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান করিতেন। গোখেল মহোদয়ও গান্ধীজিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে ভারতের ভাবী নেতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সমাদর করিতেন। ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরের দোষ কখন দেখিতে পাইতেন না, কেবল গুণেরই আলোচনা করিতেন। যদিও ইহাঁদের নানা বিষয়ে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, তথাপি ইহাঁরা অচ্ছেদ্য বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। গান্ধীজি দেখিতেন গোখেল মহোদয় তাঁহার অসামান্য প্রতিভা লইয়া সাম্রাজ্যের মন্ত্রণা সভায় নির্ভীক বীরের ন্যায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন এবং তাঁহার অর্থ-নীতি ও রাজ-নীতি বিষয়ক যুক্তি তর্ক শ্রবণ করিয়া বিলাতের বড় বড় মনস্বী ব্যক্তি চমৎকৃত হইতেছেন, তিনি দেখিতেন ত্রিশ কোটী ভারতবাসী ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে গোখেল মহোদয়কে অদ্বিতীয় জন-নায়ক জ্ঞানে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেছেন, গান্ধীজি বিমুগ্ধ হইতেন। আবার গোখেল মহোদয় ও গান্ধীজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। গোখেল মহোদয় দেখিতেন গান্ধীজি ঋষিতুল্য আত্মত্যাগের জীবন্ত মূর্ত্তি। গান্ধীজি দেশের জন্য সমস্ত জীবন নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন অথচ কখনও কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বীরোচিত নেতৃত্ব এবং হৃদয়ের বলের জন্য তিনি পৃথিবী মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট মানব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজের দৃষ্টান্তে প্রমানিত করিয়াছেন যে তাঁহার দেশের প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানবটিও সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত আছে। গান্ধীজির স্বার্থত্যাগ ও

নির্ভীক সত্য-প্রিয়তা দেখিয়া সমগ্র জগৎ আজ ভারতবর্ষকে সম্মান করিতে শিখিয়াছে। এরূপ অসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের প্রধানতম নেতা হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? গোখেল মহোদয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণধী পুরুষের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু মাননীয় গোখেল দেখিলেন গান্ধীজির রাজনৈতিক মতগুলি অত্যন্ত উন্নত ধরণের হয়ত ভারতের জন-সাধারণ সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিবার শক্তি এখনও অর্জ্জন করেন নাই। তাই গোখেল মহোদয় গান্ধীজিকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার পর গান্ধীজি এক বৎসর কাল নিজ রাজনৈতিক মত প্রচার করিবেন না এবং এই এক বৎসর তিনি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া তথাকার রাজনৈতিক অবস্থা ও জনগণের রাজনৈতিক উপযুক্ততা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তার পর এক বৎসর অতীত হইলে গান্ধীজি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন তদনুযায়ী রাজনৈতিক মত প্রচার করিতে পারিবেন। ইং ১৯১৫ সালে গান্ধীজি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া গোখেল মহোদয়ের উপদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই ইং ১৯১৪ সালে সালে ইউরোপে ভয়াবহ জর্ম্মন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি শুনিলেন গোখেল মহোদয় তৎকালে পীড়িত অবস্থায় বিলাতে রহিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার সেবা করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজি ও তাঁহার পত্নী বিলাত গমন করিলেন এবং যাইয়া দেখিলেন যে গোখেল মহোদয় ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। গান্ধীজি অক্লেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তিনি বুঝিলেন যে সাম্রাজ্যের প্রতি ভারতবাসীর যে কর্ত্তব্য আছে, সে

কর্ত্তব্য অবশ্যই পালন করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তিনি বিলাতে থাকিয়া ইংরাজ সৈন্যের সেবা করিবার জন্য লণ্ডন-বাসী ভারতীয়গণকে লইয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈয়ার করিলেন এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী উভয়েই এই বাহিনীতে নাম লিখাইলেন। কিন্তু গান্ধীজির স্বাস্থ্য পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছিল এবং এক্ষণে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য তাঁহার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, যে তাঁহার সরকারী ও অন্যান্য বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

১৯১৫ সালের প্রথমেই গান্ধীজি সস্ত্রীক ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অ্যাপোলো বন্দরে বিরাট জন-মণ্ডলী একত্রিত হইয়া ভারতের ভাবী জন-নায়ককে সংবর্দ্ধনা ও সম্পূজিত করিলেন। দুঃখের বিষয় ঠিক এই সময় গা ন্ধির রাজনৈতিক গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখেল মহোদয় সহসা ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গধামে প্রয়ান করিল। গোখেল মহোদয়ের মহাপ্রস্থানে যে স্থান শূন্য হইল, সে স্থান গান্ধীজির আবির্ভাবে পূর্ণ হইল কিনা তাহা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ণয় করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর অশেষবিধ সৎকার্য্যের জন্য প্রীত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বর্ণ নির্ম্মিত কাইসর ই-হিন্দ্ নামক মেডেল উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন। গান্ধীজি ধীর চিত্তে নিজের জীবনের মহাব্রত উদ্যাপনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি গুজরাটের রাজধানী আহম্মদাবাদে অবস্থান করিয়া তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। আহম্মদাবাদে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার নাম "সত্যগ্রহাশ্রম"। এই আশ্রমে গান্ধীজি বহুসংখ্যক বালক বালিকাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, বাল্যকাল হইতে দৈন্যকে বরণ করিয়া লইয়া যাহাতে তাহারা

উত্তর কালে দুঃখ ও কষ্টের তাড়নে কাতর না হয় এবং স্বার্থকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া যাহাতে দেশের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য মহাত্মাজী তাহাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই আশ্রমের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দৈনিক কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। অনেকেই চরকার দ্বারা সূতা কাটে এবং তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে।

আহম্মদাবাদে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা শেষ করিয়া গান্ধীজি ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল গুলি পরিভ্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সর্ব্বপ্রদেশের জনগণ গান্ধীজির দর্শন পাইবার নিমিত্ত ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। তিনি কোন স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র সহস্র সহস্র নরনারী একত্র সমবেত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক নগর মহাত্মাজীর জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, তথাপি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে এক বিংশতি বর্ষ ধরিয়া তত্রত্য ভারতীয়গণের মঙ্গলের জন্য যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও নির্ভীকতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছিলেন।

এই পরিশ্রম কালে গান্ধীজির নিজ মতামত প্রকাশ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক স্থলের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা। কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই জনগণ তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করায়, সংবর্দ্ধনার উত্তরে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। তিনি বক্তৃতা প্রদান কালে শ্রোতৃবর্গের প্রশংসা বা নিন্দার

দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের মনোভাব সরল ও নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে তাঁহার প্রত্যেক ভাবটি এবং ভাবের অভিব্যক্তি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ। ১৯১৫ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে মাননীয় লায়ন সাহেব মহোদয়ের সভাপতিত্বে তৎকালে বঙ্গদেশে যে সকল রাজনৈতিক ডাকাইতি ও নরহত্যা সংঘটিত হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে গান্ধীজি তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্ট এবং তেজঃপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে ডাকাইতি এবং গুপ্ত নরহত্যা দ্বারা কখন দেশের উন্নতি সাধন করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন অহিংসাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল নীতি। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে অনিষ্টকারী ব্যক্তির প্রতিও বল প্রয়োগ করা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। গুপ্ত হত্যা ভারতে কখন প্রশংসিত হয় নাই। ইহা কদাচার বলিয়া চিরদিন নিন্দিত হইয়াছে। এই সকল কদাচার পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে ভারতে বর্ত্তমান যুগে আসিয়াছে। ইহার ফল অত্যন্ত অমঙ্গল জনক এবং এই সকল কদাচার ভারতবাসীর যত্নের সহিত পরিহার করা কর্ত্তব্য।

এই বৎসরেই এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ সহরে মাননীয় কর্বেট সাহেব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গান্ধীজি বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কতকগুলি আদর্শ আছে। সে আদর্শগুলি উচ্চ এবং তিনি সে গুলিকে আদরের সহিত ভালবাসেন। একটি আদর্শ এই যে প্রত্যেক প্রজাই নিজ উৎসাহ, এবং নিজ বিবেক অনুসারে কার্য্য করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়া থাকে। তিনি কোন গভর্ণমেণ্টেরই অনুরাগী নহেন। তবে তিনি বিবেচনা করেন যে, যে গভর্ণমেণ্ট প্রজার স্বাধীনতায় অতি অল্প পরিমাণে হস্তক্ষেপ করেন, সেই

গভর্ণমেণ্টই প্রচলিত গভর্ণমেণ্ট গুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট। তিনি অনুভব করিয়াছেন যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অকারণ কোন প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। এই জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহার ভক্তি জন্মিয়াছে। মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গান্ধীজি মান্দ্রাজের ছাত্র সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সভ্যতা অশেষ অমঙ্গলের আকর স্বরূপ। এই সভ্যতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া পাশ্চাত্য জাতিগুলি বিপদ সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। তাহারা যে অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতেছে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে মনে দুঃখ ও কষ্টের উদ্রেক হয়। দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এই পাশ্চাত্য সভ্যতাই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন কোন ভারতবাসী বলেন যে আমাদের শাসক সম্প্রদায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে আনয়ন করিয়াছেন তখন সে সভ্যতা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গান্ধীজি এই কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। তিনি ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "তোমরা খুব ভুল বুঝিয়াছ। মনে রাখিও, যদি তোমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিতে স্বীকার না কর, তবে কোন শাসকই তোমাদিগকে সে সভ্যতা আনিয়া দিতে পারেন না। আর যদি ইহাই হয় যে শাসকগণ সে সভ্যতা আমাদিগের সম্মুখে আনয়ন করেন, তবে ইহা নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে এমন শক্তি আছে, যে শক্তির প্রভাবে আমরা শাসকগণকে প্রত্যাখ্যান না করিলেও, তাঁহাদের আনীত সভ্যতাকে দৃঢ়তার সহিত পরিহার করিতে পারি।" তিনি ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "আমি নিজে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী, কারণ আমার বিশ্বাস সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার সহিত সমান অধিকার দাবী করিবার আমার সুযোগ আছে। আম আজ এই সমান অধিকার দাবী করিতেছি। আমি পরাধীন জাতির অন্তর্গত নহি। আমি নিজেকে পরাধীন জাতি বলিয়া মনে করি না।

(শ্রোতৃবর্গের আনন্দ ধ্বনি হইল)। কিন্তু ইহা মনে রাখিও যে তোমাদের এই অধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে ইংরাজ শাসকগণ বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারেন না। যদি তোমরা ইহা চাও, তবে তোমাদিগকে নিজেই ইহা লইতে হইবে; তোমাদের নিজের নিজের কার্য্যের দ্বারা ইহা অর্জ্জন করিতে হইবে। আমি সমান অধিকার চাই এবং আমি ইহা লইতে পারি। আমার কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়াই আমি এই অধিকার অর্জ্জন করিব। সাম্রাজ্যের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিলেই, আমার অধিকার আমি অবশ্যই প্রাপ্ত হইব।" তৎপরে গান্ধীজি বলেন যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মোক্ষ মূলর মহোদয়ের মতে হিন্দুধর্ম্মের অর্থই হইতেছে, কর্ত্তব্য পালন। এই জন্য তিনি শ্রোতৃবর্গকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এবং বলেন যে একমাত্র কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই ভারতবাসী স্বাধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে পূর্ণ মনস্কাম হইতে পারিবেন।

এই সময় হইতেই হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিবার জন্য, এবং ভারতের লুপ্ত প্রায় শিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য গান্ধীজি প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন।

১৯১৫ সালে বাঙ্গালোর নগরে তিনি গোখেল মহোদয়ের চিত্র উন্মুক্ত করিবার কালে বলিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি গোখেল মহোদয়ের একজন শিষ্য এবং গোখেল মহোদয়কে তিনি নিজের 'রাজা গুরু' বলিয়া সম্মান করেন।

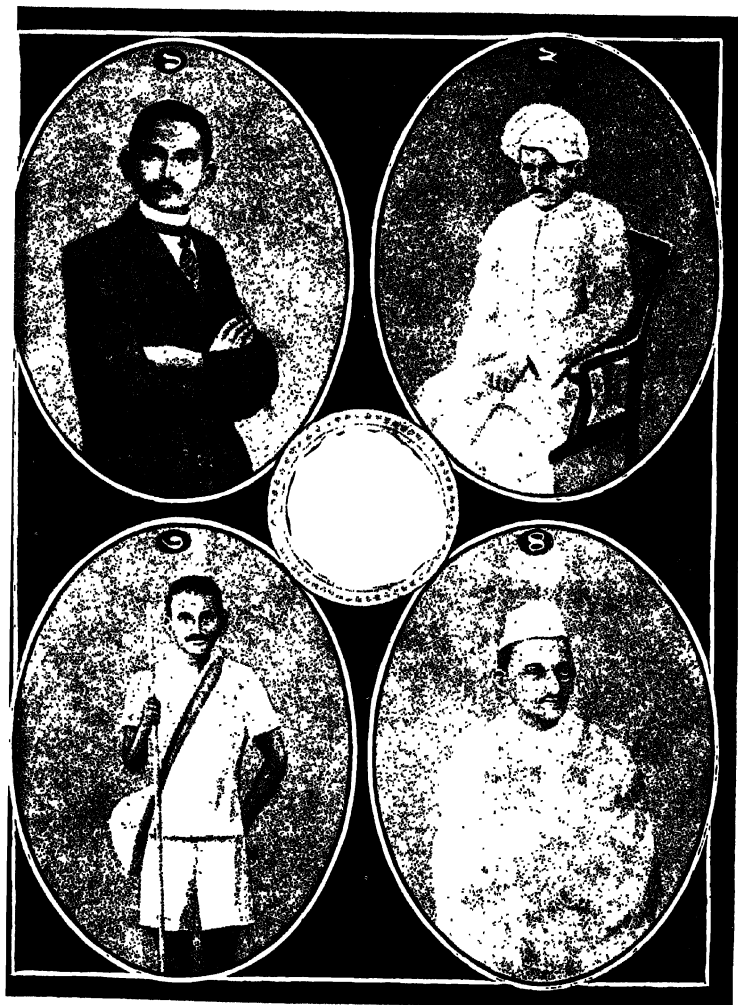
১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদের মুইর কলেজে তিনি আর্থিক বনাম নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার মৌলিকতার ও প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই প্রবন্ধটি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাধারণের মঙ্গল ও অমঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক মানবকেই নিজের বিবেক অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। এরূপ ভাবে কার্য্য করিলে কখন আত্ম-প্রবঞ্চনার কারণ ঘটে না। সময়ে সময়ে কর্ম্মীকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য করুণাময় পরমেশ্বর কখন চিরতরে ব্যর্থ করেন না। ক্ষণিকের জন্য কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইলেও, অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় গৌরব রবি পূর্ণ জ্যোতিতে উদিত হইয়া কর্ম্মীকে ও কর্ম্মীর দেশকে মহিমময় করিয়া তুলিবে। মহাত্মা-গান্ধীর ইহাই অভিমত, এবং তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়াই সমগ্র জীবন কর্ম্মে রত হইয়া আছেন। তিনি বহুবার বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছেন এবং দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন কিন্তু কখনও কর্ত্তব্য-চ্যুত বা সত্য-ভ্রষ্ট হন নাই।

১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও অনুরোধ অনুসারে গান্ধীজি বিহার প্রদেশের শ্রমিকগণের প্রকৃত অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য চাম্পারণ জেলা গমন করিয়াছিলেন। কংগ্রেসে কথিত হইয়াছিল যে বিহারের আবাদ-ক্ষেত্রের কর্ত্তৃপক্ষ ইংরাজগণ শ্রমজীবিগণের উপর অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করেন এবং তজ্জন্য সকলে পক্ষপাতিত্ব শূন্য এবং সত্যপ্রিয় গান্ধীজিকেই তদ্বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে মতিহার যাইবার জন্য গান্ধীজি মজাঃফরপুর ষ্টেশনে দিবা দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে আরোহণ করেন। পরদিন "১৬ই এপ্রিল" ভারতের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিবস চাম্পারণ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গান্ধীজির উপর নোটিস জারি করিয়া আদেশ দেন যে নোটিশ

ব্যারিষ্টার গান্ধী　　নাগরিক গান্ধী



সৈনিক গান্ধী　　মহাত্মা গান্ধী

প্রাপ্তির পর যে গাড়ীখানি প্রথম পাওয়া যাইবে, সে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া গান্ধীজিকে চাম্পারণ জিলা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ আদেশ দিবার কারণ কি তাহাও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নোটিশের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে চাম্পারণ জিলাতে গান্ধীজি উপস্থিত থাকিলে তথায় শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে এবং ফলে নানারূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া জনগণের প্রাণনাশও ঘটিতে পারে। সম্ভবতঃ চাম্পারণের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ মহাত্মা গান্ধীজিকে বিশেষরূপে জানিতেন না ও বুঝিতেন না। মহাত্মাজীর নির্ভীক সত্য প্রিয়তা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিষয় অবগত থাকিলে, বিবেক দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যিনি চাম্পারণে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী গান্ধীর প্রকৃতির বিষয় যদি চাম্পারণের কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতেন, তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনার সহিত তাঁহারা কার্য্য করিতেন, এবং হয়ত গান্ধীজির উপর নোটিশ জারি না করিয়া অন্য কোন গৌরবযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিতে পারেন নাই যে এরূপ নোটিশ গান্ধীজি সম্মান করিতে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজিকে জানিতেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজির নিরূপদ্রপ বাধা-প্রদান-মূলক আন্দোলনের বিষয় যাঁহারা অবগত ছিলেন, তাঁহারা প্রথমেই বুঝিয়াছিলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নোটিশ গান্ধীজির মানসিক শক্তির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। গান্ধীজি নোটিশ প্রাপ্তির পর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—"সাধারণের নিকট আমার যে দায়িত্ব আছে, তাহা বুঝিয়া একথা বলা আমার কর্ত্তব্য মনে করিতেছি যে আমি এক্ষণে এই জেলা ত্যাগ করিয়া যাইতে অক্ষম। তবে কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। আমি সে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত

আছি। কমিশনার সাহেব মনে করিয়াছেন যে আমি এই জেলাতে একটি প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তাঁহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার এখানে আসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, শ্রমিকগণের প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং যতক্ষণ আমি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পাইব ততক্ষণ আমার এই উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কার্য্য করিতে থাকিব।”

১৮ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে যদি তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, তবে অকারণ মোকদ্দমাটি অনেক দিন ধরিয়া চলিবে এবং অনেক সময় নষ্ট হইবে। এই কারণে তিনি আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া প্রথমেই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু উচ্চতর রাজকর্ম্মচারিগণের উপদেশ অনুযায়ী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দিবসে রায় প্রকাশ করিলেন না। ইতিমধ্যে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষগণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গান্ধীজির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং তদনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী মুক্তি লাভ করিলেন।

সরকার বাহাদুর এই উদারতা দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন না। তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে শ্রমিকগণের উপর অত্যাচার হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্য বিহার প্রদেশস্থ শ্রমজীবিগণের প্রকৃত অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে এই কমিটির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত করিলেন। গান্ধীজি অন্যান্য সভ্যগণের সহিত একযোগে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি ধীরভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালিত করায়, সকল সত্য তথ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সত্য সত্যই যে শ্রমিকগণের উপর অত্যাচার

হইত তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। গান্ধীজি ইচ্ছা করিলে তিনি যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে বিহারের আবাদ-কোম্পানিগণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু গান্ধীজি কখন প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিলেন না। তিনি কোন প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে শ্রমিকগণের উপর আর অত্যাচার হইতে না পারে তাহারই উপায় উদ্ভাবন ও সুব্যবস্থা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তিনি সকলের নিকট প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ইং ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চাম্পারণের আবাদ ক্ষেত্র বিষয়ক নূতন আইন বিহারের ব্যবস্থাপক সভাতে যখন প্রস্তাবিত হয়, তখন মাননীয় মড্ সাহেব মহোদয় শ্রমিকগণের উপর অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া সরল ভাবে প্রকাশ করেন যে বাস্তবিকই তাহাদের উপর যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং এই প্রসঙ্গে গান্ধীজির পক্ষপাতশূন্য কার্য্যের তিনি উপযুক্ত ভাষায় প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইং ১৯১৭ সাল হইতে গান্ধীজির জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ভারতীয়গণ এখনও তাহা কিছুমাত্র বিস্মৃত হন নাই। নিরুপদ্রব বাধা-প্রদান মূলক নীতিই মহাত্মাজীর সকল কার্য্যের মূল নীতি। তিনি যখনই দেখিয়াছেন কর্ত্তৃপক্ষের কোন বিশেষ কার্য্য দেশবাসিগণের স্বার্থের প্রতিকূল হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত নীতির অনুসরণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বাধা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে তাঁহার চেষ্টার ফলেই ভারতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পুনরাবির্ভাব হইতেছে। অধঃপতিত জাতির এই নব জাগ্রত মনুষ্যত্ব করুণাময় পরমেশ্বরের পূর্ণ দান। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এই নব-স্ফূর্ত্ত মনুষ্যটিকে অতি ধীরে ও সতর্কতার সহিত বিধি-সঙ্গত পন্থাতে পরিচালিত করিতে হইবে। এবং সেরূপ করিলে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দ্রুত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। ভারতের বহুদিনের অস্তমিত গৌরব-রবি আবার ভারতের অদৃষ্টাকাশে পূর্ণজ্যোতিতে উদীয়মান হইবে।

গান্ধীজির অনুসৃত নীতি অনেক সময় প্রচলিত গবর্ণমেণ্টের বিধিগুলির বিরোধী হইয়া পড়ে। এই জন্য ভারতের বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি গান্ধীজির মনুষ্যত্বকে পূজা করিলেও, তাঁহার অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যে যোগ দিতে পারেন নাই। মহাত্মাজীর আইন-অমান্য নীতি বর্ত্তমান ভারতের অবস্থার উপযোগী নহে। ভারতের অনেক মনস্বী নেতা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজি আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ক্রমশঃ দেশের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম

করিতেছেন। এরূপ মনে হয় যে আইন অমান্য সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি তিনি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতে আসিয়া কারারুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বর্দ্দোলীতে যে কয়েকটি অভিনব প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই মহাত্মাজী প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দেশবাসিগণ এখনও অহিংস-নীতি অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং সম্পূর্ণরূপে হিংসা শূন্য হন নাই, এবং তজ্জন্য বর্ত্তমান অবস্থাতে আইন অমান্য আন্দোলন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না। এইজন্য তিনি জনসাধারণকে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহাই হউক এই সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অভিমত সমূহ ক্রমশঃই এই পুস্তকের শেষভাগে বিবৃত হইবে।

১৯১৭ সালের শেষভাগে কায়রা জেলাতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদে গান্ধীজির কোমল প্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি কায়-মনো-বাক্যে আর্ত্তের সেবায় রত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন কায়রা বাসীর এরূপ বিপদ ও অর্থাভাবের সময়েও কর্ত্তৃপক্ষ টেক্স আদায় করিতেছেন, এবং দুর্ব্বল কায়রাবাসী কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে নিজেদের গো-মহিষাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া টেক্স আদায় দিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গুজরাট সভা হইতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিলেন যে কায়রা বাসীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থাতে তাহাদের নিকট প্রাপ্য অর্থ আদায় করা অস্থায়ী ভাবে বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহাত্মার সরল উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ফলে গান্ধীজি অনন্যোপায় হইয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সত্যাগ্রহকালে ১৯১৮।৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিরুপদ্রব বাধা-প্রদান-নীতির মূল সূত্র দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন সত্যাগ্রহীগণকে মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহারা কোন কারণে অপরের উপর অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন না। ন্যায় বিচার পাইবার জন্য তাঁহাদের নিজদিগকেই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণা বা লাঞ্ছনা আনন্দের সহিত সহ্য করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে গভর্ণমেণ্টের ভয় করিবার কোন কারণ নাই; কারণ আন্দোলনকারিগণ গভর্ণমেণ্টের সকাশে কেবলমাত্র ন্যায় বিচার লাভ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ন্যায়-বিচারের অধিক তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছুই দাবী করিতেছেন না। তিনি আরও বলেন— "বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দুইটি পথ আমাদের সমক্ষে পড়িয়া রহিয়াছে। হয় আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে হিংসা-যুক্ত বিদ্রোহ করিতে হইবে, কিংবা নিরুপদ্রব বাধা-প্রদান-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। আমি আমার দেশবাসিগণকে চিরদিনই হিংসা ত্যাগ করিতে বলিয়াছি এবং নিরুপদ্রব বাধা-প্রদান-নীতিরই অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছি। আমার স্থিরবিশ্বাস গুজরাটের জন-গণের দুঃখ দূর করিতে হইলে, আমাদিগকে সাহসের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিকট সত্য কথা বলিতে হইবে, এবং সেরূপ করিলে গভর্ণমেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে আমাদের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস আমরা যদি আমাদের প্রতিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কায়রা-বাসিগণকে আর কখনও অন্যায় বা অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না।"

১৯১৮ সালের মার্চ্চমাসে আহম্মদাবাদের মিল্ সমূহের কুলিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া একযোগে কার্য্য ত্যাগ করায় মিলের কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কুলিরা আপত্তি করিয়াছিল যে তাহাদের পরিশ্রমের তুলনায় পারিশ্রমিক তাহারা অতি অল্পই পাইয়া থাকে। এই ধর্ম্মঘট মীমাংসা

করিয়া দিবার জন্ত মিলের সত্বাধিকারিগণ মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী যত্নের সহিত কুলিগণকে পরিচালিত করিতে-ছিলেন, কিন্তু সহসা কতকগুলি ব্যক্তি দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করায়, নানা প্রকার উপদ্রব ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ব্যাপারটি ক্রমশঃ এতই গুরুতর হইয়া পড়িয়াছিল যে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মাজী ও কুমারী অনসূয়া-বাই অনশন ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকে গান্ধীজির এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন যে গান্ধীজি মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাণে দয়ার উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ গান্ধীজি জানিতেন যে মিলের সত্বাধিকারিগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করিলে, মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইবে: এবং তাহা হইলেই তাঁহারা ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইবেন। কিন্তু এরূপ সন্দেহ যুক্তি সঙ্গত হয় নাই। গান্ধীজির ন্যায় মহাতেজস্বী পুরুষ কখন এরূপ কাপুরুষোচিত উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিতে পারেন না। মহাত্মাজী নিজেই এ সম্বন্ধে দিন কয়েক পরে একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন :—"আমি যে অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, এজন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই; বরঞ্চ আমার বিশ্বাস যে আমি যদি এরূপ না করিতাম, তাহা হইলে আমি সত্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতাম। মিলের স্বত্বাধিকারিগণের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া কোনপ্রকার সুবিধাজনক মীমাংসা করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে আমি অনশন ব্রত গ্রহণ করি নাই। সে উদ্দেশ্যে এই ব্রত গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত কদর্য্য অবিচার করা হইত, এবং তাঁহাদের প্রীতিলাভ করিবার আমি অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইত। তবে এই ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই আমি জানিতাম যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে

আমি অনশন ব্রত অবলম্বন করিলে, লোকে আমার উদ্দেশ্য ভূল বুঝিতে পারে। কিন্তু কি করি উপায়ান্তর ছিল না; দশ সহস্র ভারতবাসী শ্রমজীবি ঈশ্বরের নাম লইয়া বারংবার যে শপথ গ্রহণ করিয়াছে, সে শপথ তাহারা সহসা ভঙ্গ করিলে কলঙ্কের সৃষ্টি হইত, তাহাতে সমগ্র জাতি ম্রিয়মান হইয়া পড়িত। সেরূপ কলঙ্কের তুলনায়, আমি যদি সত্যই অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া মিলের কর্তৃপক্ষগণের প্রাণে দয়ার উদ্রেক করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়াই বিবাদটি কুলিগণের সুবিধা জনক রূপে মিটাইয়া লইতাম, তাহাতে আমার যে কলঙ্ক হইত, সে কলঙ্ক অতি তুচ্ছ। নিজের দেশবাসিগণকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে হইলে এবং মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠানের উপযুক্ত করিতে হইলে, মানবকে সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। তাহার প্রতিজ্ঞাকে যাহাতে সমগ্র জগৎ অচল অটল বলিয়া বিশ্বাস ও সম্মান করে, এরূপভাবে মানবকে সত্যপালন করিয়া চলিতে হইবে। সত্যের প্রতি কঠোর অনুরক্তি না থাকিলে, কখনও প্রকৃত জাতীয়তার কোন দেশে অভ্যুদয় হইতে পারে না।

ইং ১৯১৮ সালের এপ্রেল মাসে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী মহানগরীতে একটি সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীজিও সেই সভাতে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু লোকমান্য তিলক মহোদয়, শ্রীমতী বেসান্ত মহোদয়া এবং আলিভাইগণের সে সভাতে নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া গান্ধীজি প্রথমতঃ সভার কার্য্যে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে লাট বাহাদুর স্বয়ং বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করায়, মহাত্মাজী আর আপত্তি না করিয়া, সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সম্রাট্ মহোদয়ের প্রতি ভারতীয়গণের রাজভক্তি জ্ঞাপক প্রস্তাবটি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর

চিরদিনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিলে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের প্রজাগণের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার সমূহ প্রাপ্ত হইবে। দিল্লীর সভার কয়েকদিন পরে তিনি যে ইস্তাহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন; "আমার যদি শক্তি থাকিত, তবে এই ভীষণ জার্ম্মাণ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আমার দেশবাসিগণকে 'স্বরাজ বা ভারতে দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপনের কথা মুখেও আনিতে দিতাম না। সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় ভারতের সমস্ত বলিষ্ঠ সন্তানগণকে সাম্রাজ্যের দ্বারে আমি বলি স্বরূপে উপস্থিত করিতাম। কারণ আমি জানি যে এই একটি কার্য্য দ্বারাই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমান অংশীদার বলিয়া পরিগণিত এবং সম্মানিত হইবে" তৎপরে মহাত্মা গান্ধী সাম্রাজ্যের সেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি একবার কায়রা জেলাতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে গিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন:—"কায়রা জেলাতে ৬০০ ছয় শত গ্রাম আছে। গড়ে প্রত্যেক গ্রামের লোক সংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক। যদি প্রত্যেক গ্রামে মাত্র ২০টি করিয়া লোক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে অনায়াসে সমস্ত জেলাতে ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। অর্থাৎ শতকরা ১৭ জন লোককে সৈন্য হইতে হইবে। ইহা এমন কিছু গুরুতর স্বার্থত্যাগ নহে। মনে রাখিতে হইবে যে এই জেলাতে প্রতি বৎসর শতকরা ১৭ জনের অধিক ব্যক্তি রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যদি আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এবং ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতেও অক্ষম হই, তাহা হইলে আমরা যে স্বরাজ পাইবার অনুপযুক্ত বিবেচিত

হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি প্রত্যেক গ্রাম ২০টি করিয়া সৈন্য প্রদান করে এবং এই সকল সৈন্য যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তবে তাহারা নিজ নিজ গ্রামের জীবন্ত স্বরাজ বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহারা এবং তাহাদের গ্রাম সমূহ ও দেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইবে।"... বলা বাহুল্য, তাঁহার আন্তরিক যত্নের ফলে ও তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ফলে বহু ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণীতে নাম লিখাইয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায়, মহাত্মাজীকে আর অধিক দিন এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় নাই।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতবর্ষে শাসনসংস্কার হইবার কথা ছিল। মহাত্মাজী তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। ভারতের তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি মণ্টেগু সাহেব মহোদয় ভারতে আসিলে তিনি গুজরাট সভা হইতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর নাম সহি করাইয়া মণ্টেগু মহোদয়ের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। যাহাতে কংগ্রেসের প্রস্তাব মত শাসন সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য গান্ধীজি কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভারতের প্রত্যেক রাজনৈতিক সমিতি ঐরূপ একখানি করিয়া আবেদন পত্র মণ্টেগু মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করেন।

দুঃখের বিষয় গান্ধীজি আর অধিক দিন গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিবার অবকাশ পান নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত রাউলাত কমিটী দেশের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সকল সমিতি নানারূপ ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে। সরকার বাহাদুর এই অমঙ্গলের প্রতীকার কল্পে কতকগুলি নূতন আইন

প্রণয়ন করিলেন। এই আইনগুলি দেশে 'রাউলাত আইন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গান্ধীজি এই আইন পাঠ করিয়া ভীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন এপর্য্যন্ত ইংরাজ শাসনে থাকিয়া ভারতবাসী যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু ভোগ করিত, নূতন আইনের ফলে সে সামান্য স্বাধীনতাটুকুও সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে। দেশের সকল নেতাগণই এ বিষয়ে গান্ধীজির সহিত একমত হইলেন। দেশের জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সমূহ তীব্র ভাষায় নূতন আইনের প্রতিবাদ করিলেন। মাননীয় শাস্ত্রী মহোদয় এবং পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজী প্রমুখ বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলের বে-সরকারি সভ্যগণ একবাক্যে কঠোরতার সহিত নূতন আইনের নিন্দা করিলেন। দেশের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য লক্ষ্য নরনারী সভাস্থলে সমবেত হইয়া এই আইনের বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প অচল অটল রহিল। ভারতীয়গণের তীব্র বাধা সত্ত্বেও সরকার বাহাদুর নূতন আইন পাশ করিয়া দিলেন।

দেশের জন-সাধারণ রোষে এবং ক্ষোভে হস্তপদবদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গান্ধীজি বুঝিলেন ইহাই উপযুক্ত অবসর। তিনি দেখিলেন সাধারণ আন্দোলন দ্বারা, আবেদন নিবেদনের নীতি অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে নমিত করা এবং তথা কথিত "নীতি হীন রাউলাত আইন" কে বিদূরিত করা অসম্ভব। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার জীবনের চির পরীক্ষিত এবং তাঁহার জীবনের মহাব্রত স্বরূপ 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন প্রচার করিয়া দিলেন। তিনি বজ্রের ন্যায় কঠোর স্বরে বলিলেন নীতিহীন দুর্নীতি রাউলাত আইনকে উঠাইতেই হইবে।

প্রতিজ্ঞা পত্রটির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—"আমার বিবেক অনুযায়ী আমি বুঝিয়াছি যে ১৯১৯ সালের ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ফৌজদারী আইন

ন্যায় সঙ্গত নহে, এবং উহা ন্যায় ও স্বাধীনতার নীতির বিরোধী এবং ইহার ফলে মানবের সাধারণ অধিকার সমূহও লুপ্ত হইবে এবং সেই জন্য আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই আইনগুলি প্রচলিত হইলে যতদিন না আবার ঐ গুলি উঠাইয়া দেওয়া হইবে ততদিন পর্য্যন্ত আমি ঐ আইন কোন্ উপদ্রবের সৃষ্টি না করিয়া অমান্য করিব এবং তাহা ছাড়া ইহার পর যে দেশীয় কমিটি নিযুক্ত হইবে সেই কমিটি সরকার বাহাদুরের প্রণীত অপর আর যে সকল আইন অমান্য করিবার উপদেশ দিবেন, আমি সেই সকল আইন ও অমান্য করিব। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই আন্দোলন চালাইবার কালে আমি সত্যের অনুসরণ করিব এবং কাহারও জীবনের, শরীরের বা সম্পত্তির হিংসা করিব না।"

তৎপরে গান্ধীজি দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে সত্যাগ্রহের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি বোম্বাই, এলাহাবাদ, মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর' নাগাপট্টম প্রভৃতি প্রধান স্থান সমূহে জনসভাকে সম্বোধন করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ৬ই এপ্রিল তারিখ তিনি 'সত্যাগ্রহ দিবস' নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং সমগ্র ভারতকে ঐ দিবস হরতাল করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রস্থানে ঐ দিবস বিরাট জনমণ্ডলী শোভা যাত্রা ও সভাসমিতি আদি করিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া সত্যাগ্রহের প্রতিষ্ঠাতে আবদ্ধ হইয়াছিল।

দিল্লী নগরী ৬ই এপ্রিল তারিখে সত্যাগ্রহ পালন না করিয়া ৩০শে এপ্রিল দিবস পালন করিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ঐ দিবস দিল্লীতে জন-সাধারণের সহিত পুলিশ বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। দিল্লীবাসিগণের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছিল যে তাহারা বলপূর্ব্বক কতকগুলি মিষ্টান্নের দোকান বন্ধ করিয়াছিল এবং ট্রাম গাড়ীর চালকগণকে গাড়ী চালাইতে দেয় নাই। অনেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং সমগ্র

জনতা অন্যায় পূর্ব্বক দিল্লী ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দিবার জন্য দাবী করিয়াছিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া যায় নাই। এতদুপলক্ষে মহাত্মাজী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যদি সমস্ত অভিযোগ গুলিই সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তথাপি সৈনিকগণকে নিরস্ত্র জনমণ্ডলীর উপর গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছিল। দিল্লীবাসী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ধৈর্য্য গুণেরই পরিচয় দিয়াছিল। চল্লিশ সহস্র ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া শান্তভাবেই সভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এজন্য তাহারা প্রশংসা পাইবারই যোগ্য। যাহা হউক দিল্লীর এই দুর্ঘটনাতে মহাত্মাজীর প্রাণ পুড়িয়া গিয়াছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি তাঁহার মনোভাব এইবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এবং কঠোরতর ভাবে সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্য দেশবাসীদের আহ্বান করিলেন। সমগ্র দেশ তাঁহার আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। অসংখ্য নরনারী জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতে মনন করিল। সমগ্র সভ্য পাশ্চাত্য জগৎ নিরস্ত্র ভারতীয়গণের এই অসাধারণ নির্ভীকতা ও স্বদেশ প্রেমিকতা দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মহাত্মাজী আইন অমান্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তকাদি প্রচার করিয়া আইন অমান্য করিবার সংকল্প করিলেন এবং 'সত্যাগ্রহী' নামক একটি পত্রিকা প্রচার করিলেন। তাঁহার নিজের লিখিত কয়েকটি নিষিদ্ধ পুস্তকও পুনর্মুদ্রিত হইল। 'সত্যাগ্রহী' পত্রের প্রথম সংখ্যাতেই প্রচার করা হইল যে এই পত্রের সম্পাদক যে কোন মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার ও বন্দী হইতে পারে। যদি একজন সম্পাদক গ্রেপ্তার হইবামাত্র

তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য অপর সম্পাদক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংবাদ পত্রটি পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আরও লিখিত হইয়াছিল যে চিরদিন ধরিয়া সংবাদ পত্র প্রচার সম্বন্ধীয় আইন ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্য কমিটির নাই। রাউলাত আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্তই সংবাদ পত্রটি প্রচার করা হইবে।

আইন অমান্য আরম্ভ কালেই মহাত্মাজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে গবর্ণমেণ্টের হস্তে শীঘ্রই তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে। ঘটিলও তাহাই। ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রাতঃকালে দিল্লী যাইবার পথে দোশি নামক স্থানে সরকারের আদেশ অনুযায়ী পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিলেন। তিনি দিল্লী জিলা এবং পঞ্জাব প্রদেশ প্রবেশ করিতে পারিবেন না, তাঁহার উপর এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইল। মহাত্মাজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেক্রেটারী দেশাই মহাশয়কে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন যে এই সংবাদে কেহ যেন ক্রোধ প্রকাশ না করেন বা কোন প্রকার অশান্তির সৃষ্টি না করেন; কারণ সেরূপ করিলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইবে।

১১ই এপ্রিল বৈকালে গান্ধীজি বোম্বাই নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তৎপরে কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় তাঁহাকে আদেশ দিলেন যে তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাহিরে যাইতে পাইবেন না এবং তাঁহার গতিবিধি তাঁহাকে এই প্রেসিডেন্সির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

এদিকে মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার সংবাদ ভারতের চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। অনেকেই এখনও মহাত্মাজীর অহিংস-নীতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রাণের দেবতা, হৃদয়রাজ্যের পূজনীয় সম্রাট গান্ধীজি গভর্ণমেণ্টের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল।

তাঁহারা শোক প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহারা ক্রোধোন্মত্ত শার্দ্দূলের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিলেন। মনে হইল যেন সমগ্র প্রকৃতি অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে। উন্মত্ত জন-সাধারণ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইয়া অশান্তির অনলে আত্মাহুতি দিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। বহু শতাব্দী পরে পতিত ভারতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, প্রাণের সেই একমাত্র পরম দেবতা গান্ধীজি আজ অবমানিত ও লাঞ্ছিত, জনমণ্ডলীর চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। তাহারা ভাবিয়া দেখিল না কিরূপ প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা হস্তোত্তলন করিতেছে। দুর্ব্বল তাহারা, অর্দ্ধভুক্ত তাহারা, কঙ্কালসার তাহারা, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাসে তাহারা বলীয়ান, প্রত্যেক ধমনীতে শক্তির প্রবাহ তাহারা ক্ষণেকের তরে অনুভব করিল। লক্ষ্যহীন হইয়া ভীমপ্রভঞ্জন বেগে চতুর্দ্দিকে তাহারা ছুটিতে লাগিল এবং সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই ধ্বংস করিয়া ফেলিল। দেশের স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া তাহারা নরহত্যা করিল; বহু উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিল; বহু অস্ত্র শস্ত্র বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, ধনাগার লুণ্ঠন করিল, রেলগাড়ী বন্ধ করিল এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল।

মহাত্মা গান্ধী এই নৃশংসতার সংবাদ পাইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন দেশ এখনও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। তিনি দেখিলেন ভারতবাসী অহিংসনীতি গ্রহণ করে নাই। তিনি অনুভব করিলেন অসময়ে এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহার আন্দোলনে এই কুফল ফলিল। তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। ১৯১৯ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে আহম্মদাবাদ নগরে যে মহতী-জন-সভা আহূত হইয়াছিল, মহাত্মাজী সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মর্ম্মভেদী যাতনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"ভ্রাতৃগণ! গত কয়েক দিবসে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আহম্মদাবাদের অত্যন্ত কলঙ্ক হইয়াছে। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি যে আমারই নামে এই সকল নৃশংসতার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই কুৎসিত অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী তাহারা আমার সম্মান করে নাই। তাহাদের কুকার্য্যের দ্বারা তাহারা আমাকে লজ্জিতই করিয়াছে। আমি অসহ্য যাতনা অনুভব করিতেছি। যদি আমার শরীরের মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি প্রবেশ করাইয়া শরীরকে বিভিন্ন করিয়া দাও তাহা হইলেও আমি এরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিব না। আমি অসংখ্যবার বলিয়াছি যে সত্যাগ্রহে হিংসা বা উপদ্রবের স্থান নাই; লুণ্ঠন বা গৃহ-দাহাদির কার্য্য সত্যাগ্রহ-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ এই পবিত্র সত্যাগ্রহের নামেই আমরা অট্টালিকা সমূহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছি, বলপূর্ব্বক অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছি, ভয় প্রদর্শন করিয়া অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছি, রেল-গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছি, টেলিগ্রাফের তার সমূহ কাটিয়া দিয়াছি, নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে হত্যা করিয়াছি এবং দোকান ও সাধারণ ভদ্রলোকের গৃহাদিও লুণ্ঠন করিয়াছি। যদি এইরূপ ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত কার্য্যের দ্বারা আমাকে ফাঁসি-কাষ্ঠ হইতে বা কারাক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে হয়, তবে আমি বিনীতভাবে বলিতেছি যে এরূপভাবে উদ্ধার পাইবার আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।

মহাত্মাজীর অনুতপ্ত হৃদয়ের ভাবরাশি তাঁহার এই বক্তৃতায় পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি যখন দেখিলেন যে দেশবাসী হিংসাশূন্য হইতে পারেন নাই, তখন তিনি সত্যাগ্রহের পরিচালনা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। ১৮ই এপ্রিল তারিখে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ দেশমধ্যে প্রচার করিলেন।

ভারতীয়গণ তাঁহার আদেশের অবমাননা করেন নাই। বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিবার শক্তি মানবের নাই। ভারতবাসী সম্পূর্ণ অহিংস হইতে পারে নাই বলিয়া মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন সমগ্র জাতিকে প্রথমতঃ অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সত্যাগ্রহের উপযোগী করিয়া লইবেন এবং প্রয়োজন মত পুনরায় এই আন্দোলনের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাকে সে অবকাশ দেন নাই। ভারতের অবস্থা সহসা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ভারতীয় মুসলমানগণ ইউরোপীয় জাতি সমূহের তুরস্কের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। নিরস্ত্র, নিঃসহায় ভারতবাসী অবস্থার তাড়নে অধীর হইয়া ঝটিতি মহাত্মার সত্যাগ্রহ পতাকা তলে সমবেত হইলেন। মহাত্মাকে পুনরায় ভারতবর্ষে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের অনুষ্ঠান করিতে হইল।

পঞ্জাব প্রদেশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। রাউলাত আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মাজীর অনুষ্ঠিত সত্যাগ্রহ পঞ্জাববাসীও আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। পঞ্জাবের তখন শাসনকর্ত্তা ছিলেন সার মাইকেল ওডায়ার। নির্ভীক পঞ্জাববাসী সত্যাগ্রহের বিধি অনুযায়ী আইন অমান্যের পূর্ণ-অনুষ্ঠান করায় স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ অনুমান করিলেন যে পঞ্জাবে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে। তাই তাঁহারা প্রয়োজন মত দমন-নীতির অনুসরণ করিতে মনন করিলেন। পঞ্জাবের স্থানে স্থানে সামরিক আইন বিহিত হইল। কর্ণেল জন্‌সন এবং বসওয়াথ স্মিথ্ কঠোরতার সহিত সামরিক আইন পরিচালনা করিলেন। পঞ্জাববাসীকে হুকুম দিয়া বুকে হাঁটান হইল, প্রকাশ্য স্থানে তাহার উপরে বেত্রাঘাত করা হইল এবং আরও বহুপ্রকার অপমান সূচক দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। সে সকল কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আবার

জালিয়ানওয়ালাবাগের জন সভাতে শ্রোতৃবর্গ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই বলিয়া জেনারল ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র নরনারীর উপর গোলাগুলি বর্ষণ করা হইল। এই সকল ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া সমগ্র সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে ইতঃপূর্ব্বে কেহই তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষ পঞ্জাবের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সকল তথ্যের অনুসন্ধান জন্য হাণ্টার কমিটি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ভারতবাসী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ভারতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি সব-কমিটি স্থাপন করিয়া পঞ্জাব অত্যাচার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য স্বাধীনভাবে নির্ণয় করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গান্ধীজি এই সম্পর্কে প্রায় ১৭০০ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্যূন ৬৫০ জন সাক্ষীর এজাহার লিখিত করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমানাদি গান্ধীজি নিরপেক্ষভাবে ও বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভারতবাসীর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের বিবরণী প্রকাশিত হইল। তাহা পাঠ করিয়া জন-সাধারণ বুঝিলেন যে জেনারেল ডায়ারের ও পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের কার্য্যাদি আদৌ ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি যুক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরেই হাণ্টার কমিটির বিবরণীও প্রকাশিত হইল। বিলাতের 'কমন্স-সভা' এবং অন্যান্য উচ্চ-মনা ব্যক্তি জেনারেল ডায়ারকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং পঞ্জাব কর্তৃপক্ষকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিলাতের লর্ডসভা অন্যরূপ ধারণা করিলেন। লর্ড ফিন্‌লে জেনারেল ডায়ারের কার্য্যের সমর্থন উদ্দেশ্যে লর্ড সভাতে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন এবং বঙ্গের স্বাবদিত লর্ড সিংহ, লর্ড ফিন্‌লের

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিলেন কিন্তু ইহাঁদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। সমগ্র সভা লর্ড ফিন্‌লের প্রস্তাবটিই গ্রহণ করিলেন। এই সংবাদ ভারতে প্রকাশিত হইবামাত্র জনগণ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। আবার ভারত-স্থিত কতিপয় ইংরাজ, জেনারেল ডায়ারকে বৃটিশ ভারতের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া সম্মান করিলেন এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টের কি ভীষণ উপহাস! ভারতবাসী মর্ম্মাহত হইলেন। পঞ্জাব-কেশরী বীর লালা লজপত রায় ঐ উৎসাহ সহ্য করিতে পারিলেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন কাউন্সিল সমূহ বয়কট করিবার জন্য তিনি পঞ্জাব প্রদেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে লালাজীর সহিত যোগদান করিলেন।

পঞ্জাবের নির্য্যাতনে সমগ্র ভারত ব্যথিত হইয়াছিল। আবার ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইউরোপের মিলিত শক্তিগণের ব্যবহারে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। ভীষণ জার্ম্মাণযুদ্ধের সময় তুরস্ক দেশ মিলিত শক্তি পুঞ্জের সহিত যোগদান করিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ কালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যুদ্ধান্তে মুসলমান সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, মিলিত শক্তিপুঞ্জ ঐরূপ কোন ব্যবস্থাই করিবেন না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে মুসলমান সাম্রাজ্যের পূর্ণতা এবং মহম্মদীয়গণের ধর্ম্মস্থান সমূহের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ শেষ হইলে পর মিলিত শক্তিগণ তুরস্ক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে মহম্মদীয়গণ সন্তুষ্ট হওয়া দূরেরকথা; অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইলেন। ভারতীয় মুসলমান-গণ বুঝিলেন তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগুরু তুরস্কের খলিফা' অবমানিত হইয়া-

ছেন. মুসলমান সাম্রাজ্যের পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং কোরাণ প্রথিত পবিত্র ধর্ম্মস্থানগুলির কর্তৃত্ব বিদেশীয়ের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ইস্লাম জগতের শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাহারা কি মিলিত শক্তির সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-গুরু 'খলিফার' উচ্ছেদ সাধনের জন্য? বহু শতাব্দীর মুসলমান সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্য মধ্যযুগে ইউরোপের 'স্পেন' প্রদেশে সেভিল্ এবং গ্রাণাডা নামক স্থানে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তদানীন্তন অধীন তমসাচ্ছন্ন ইউরোপের জাতি সমূহের হৃদয়ে প্রজ্ঞার আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল--যে সাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী সমগ্র দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের আকাশমণ্ডলে ধর্ম্মের গৌরবে পত পত রবে সর্ব্বদা উড্ডীন থাকিত এবং যে বৈজয়ন্তী তলে সমস্ত ইউরোপীয় জাতি সমূহ একদিন অবনত মস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত ইতিহাস প্রথিত প্রাচীন মুসলমান সাম্রাজ্যটি ধ্বংস করিবার জন্যই কি তাহারা মিলিত শক্তির পক্ষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং নিজেদের ধন-প্রাণ অম্লানচিত্তে বিসর্জ্জন দিয়াছিল? মিলিত শক্তির বিকট উপহাসে ইস্লাম জগৎ স্তম্ভিত হইল। মহম্মদীয়গণ মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়ে কোটি বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিলেন। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্রোধো-দ্দীপ্ত হৃদয়ে ইস্লামের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ভারতের সপ্তকোটি মুসলমান গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে জাতির সম্মান রক্ষার জন্য ইস্লাম জগতের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন ভারতে একটিও মুসলমান যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা ইস্লামের সম্মান, খলিফার 'ইজ্জৎ' প্রাণ দিয়াও রক্ষা করিবেন। ভারতের সর্ব্বত্র খিলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইস্‌লাম ভারতের ধর্ম্ম বিশ্বাস দেখিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ গলিয়া গেল। উন্নতপ্রাণ বীর গান্ধী ছুটিয়া গিয়া ইস্‌লাম ভারতকে আলিঙ্গন করিলেন। গান্ধীজি হিন্দু হইলেও, মুসলমান হিন্দুর ভাই। হিন্দু ও মুসলমান ভারতের পবিত্র ক্রোড়ে ছয়শত বৎসরেরও অধিক কাল একত্র বাস করিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই দেড়শত বৎসরেরও অধিক ইংরাজ শক্তির অধীনে একই নীতিতে, একই ভাবে চালিত ও শাসিত হইতেছে। মুসলমানের দুঃখে হিন্দুর দুঃখ এবং হিন্দুর দুঃখে মুসলমানের দুঃখ। মহাত্মাজী এই অবস্থা হৃদয়ে অনুভব করিয়া ব্যথিত মুসলমানগণকে ভাই বলিয়া বক্ষে ধরিলেন এবং খিলাফতের সহায়তায় কায়মনোবাক্যে অগ্রসর হইলেন। সমগ্র হিন্দু ভারত মহাত্মার পশ্চাৎ ছুটিল। বলাই বাহুল্য মহাত্মাজী খিলাফতে যোগদান করায় অচিরাৎ খিলাফৎ একটি প্রবল শক্তিতে পরিণত হইল। মহাত্মাজীর আর মুহূর্ত্তেরও অবসর রহিল না। পঞ্জাবের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে—মহম্মদীয়গণের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে, ইহার আশু প্রতীকারের জন্য মহাত্মাজী সমগ্র হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া ভারতব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। এই আন্দোলন 'অসহযোগ—আন্দোলন' নামে প্রথিত। ইহার মূলসূত্র 'অহিংসা'। মহাত্মাজী সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে অসহযোগের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বিদ্যুৎবেগে মহাত্মাজী কোটি কোটি ভারতবাসীকে অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সম্ভবতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তখন অসহযোগ ব্যাপারটি কি এবং ইহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইতে পারে তাহারই বিচারে ব্যস্ত ছিলেন এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মহাত্মার তেজোপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। মহাত্মার অসাধারণ ও অসামান্য কর্ম্ম-তৎপরতার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারত নবীন অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গেল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাগণ

তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের ইতিকর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া অসহযোগ সম্বন্ধে সকলের মতামত নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কলিকাতা মহানগরীতে ইংরাজী আগষ্টমাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল। ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই জনগণের প্রতিনিধিসমূহ কলিকাতায় আসিয়া মহাসভাতে যোগদান করিলেন। এই সভাতে ৫৮১৪ জন দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরাগ্রগণ্য দেশহিত-ব্রতাবলম্বী সর্ব্বস্বার্থত্যাগী বিরাট নেতা মনীষী লালা লজপত রায় এই মহাসভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য সভাতে মহাত্মাজীর প্রস্তাব আলোচিত হইবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রদেশের নেতাগণের মধ্যে এই প্রস্তাব লইয়া বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গের শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি এক্ষণে দেশবন্ধু নামে সমগ্র ভারতে সুপরিচিত, যুক্ত প্রদেশের বহুদর্শী পণ্ডিত প্রবীণ নেতা মদনমোহন মালব্যজী; বোম্বাইএর নির্ভীক নেতা জিন্না মহোদয়, মহাত্মাজীর অসহযোগের সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ নূতন কাউন্সিল বয়কটের প্রস্তাব তাঁহারা দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যে বাধাপ্রদান ব্যবস্থাই ইঁহারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। ভারত হিতৈষিণী শ্রীমতী আনি বেশান্ত মহোদয়া অসহযোগ আন্দোলন ভারতের পক্ষে আদৌ মঙ্গলজনক নহে এরূপ স্থির করিয়াছিলেন এবং অসহযোগ নীতির বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি লালা লজপত রায় মহোদয় মহাত্মাজীর সহিত কাউন্সিল বয়কট সম্বন্ধে একমত হইলেও স্কুল ও কলেজ বয়কট এবং আদালত বয়কট সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ লালাজী ব্যক্তিগত ভাবে অসহযোগের পক্ষপাতী হইলেও জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে

অসহযোগ গ্রহণ আদৌ সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু অসহযোগ মহাত্মাজীর চিরপরীক্ষিত নীতি। তিনি এই নীতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থান কালে তত্রত্য ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্ম বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতের অবস্থাতে অসহযোগ প্রযুক্ত হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়াছেন। ধ্যানমগ্ন যোগী তুলাদণ্ড লইয়া অসহযোগের সুফল এবং কুফল পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন অসহযোগই একমাত্র পন্থা। দুর্ব্বলের পক্ষে, প্রবলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে মূর্ত্তসত্য অসহযোগের অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহাই মহাত্মাজীর দেব-হৃদয়ের ধ্রুব বিশ্বাস। মহাত্মাজীর হৃদয়ের এই অচল অটল বিশ্বাস তাঁহার সম্মুখের সমস্ত বাধা বিপত্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে মহাত্মার সরল বিশ্বাস সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং কংগ্রেস মহাসভা আহূত হইবার পূর্ব্বেই ভারতের জনমণ্ডলী অসহযোগের নির্ভীক মাধুর্য্য এবং সত্য-প্রতিষ্ঠিত শক্তিতে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মাজী তাঁহার অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার জন্ম দণ্ডায়মান হইবামাত্র অসংখ্য দর্শকমণ্ডলী এবং সহস্র সহস্র প্রতিনিধিপূর্ণ সেই বিরাট মহাসভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে মহোল্লাস ও মহোৎসাহের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন জাতির পরমাত্মা স্বয়ং ভারতের তেত্রিশ কোটি নর নারীকে বহুদিনের পর আর একবার উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের পথে পরিচালিত করিবার জন্ম পুনরায় গান্ধীমূর্ত্তি মহাসভার বক্তৃতামঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিল। মহাত্মার উচ্চারিত প্রত্যেক বাণী সমগ্র সভা ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে শ্রবণ করিয়াছিল। প্রারম্ভেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মহাত্মার প্রস্তাব জয়যুক্ত হইবে।

মহাসভার উচ্চ আনন্দধ্বনি মধ্যে মহাত্মাজী প্রস্তাব করিলেন, যেহেতু খিলাফত ব্যাপারে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ইস্‌লাম ভারতের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যুদ্ধকালে মহম্মদায়-গণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই এবং যেহেতু মুসলমান ভ্রাতার ধর্ম্মসক্রান্ত বিপৎপাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর তাহার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের দুর্ঘটনার কালে কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্জাবের নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং যে সকল রাজকর্ম্মচারী তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল তাহাদিগকে রীতিমত দণ্ড দিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সেইজন্য এই কংগ্রেস মত প্রকাশ করিতেছেন যে যতদিন ঐ সকল অবিচারের প্রতীকার না হয় ততদিন ভারতবাসীর মনে শান্তি বা সন্তোষ থাকিতে পারে না। এই কংগ্রেস আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে জাতীয় সম্মান রক্ষা করিতে হইলে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভারতবাসীর উপর অন্যায় অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই কংগ্রেস স্থির করিলেন যে যতদিন ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইবে এবং উপরোক্ত অন্যায় সমূহের প্রতীকার না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে অহিংস-অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন যে—

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উপাধি এবং পদ এবং গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে অবৈতনিক কার্য্য প্রত্যাহার করিবেন।

(২) কেহই গবর্ণমেণ্টের আহূত 'লেভি' দরবার বা সভাসমিতিতে যোগদান করিবেন না।

(৩) গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত এবং শাসিত স্কুল ও কলেজ সমূহ হইতে ভারতীয় ছাত্রগণকে বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং ভারতে জাতীয় পাঠাগার সমূহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন প্রকার কার্য্য করিবার জন্য কেহই মেসোপোটেমিয়া যাইবেন না।

(৫) যাঁহারা নূতন কাউন্সিলের সভাসদের পদ পাইবার প্রার্থী হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের আবেদন পত্র ফিরাইয়া লইবেন। এবং যদি কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের উপদেশ অমান্য করিয়া কাউন্সিলের মেম্বর হইবার জন্য উদ্যোগী হন, তবে ভোটাধিকারিগণ কোনক্রমেই এরূপ ব্যক্তির অনুকূলে ভোট দিবেন না।

(৬) ভারতের জনসাধারণকে স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস উপদেশ দিতেছেন যে কোন ভারতবাসী অতঃপর বিদেশজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন না এবং পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তাঁহারা স্বহস্তে 'চরকা' সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করিবেন ও দেশীয় তন্তুবায়গণ দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইবেন।

মহাত্মাজী একটি সুযুক্তিপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটি সমর্থিত করিলেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত পাল, দেশবন্ধু দাস এবং অন্যান্য নেতাগণ তাঁহাদের সংশোধিত প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু মহাত্মাজীর সরল আহ্বানে মহা-সভার প্রাণ দ্রবীভূত হইয়াছিল। আর কাহারও আহ্বান সে প্রাণস্পর্শ করিতে পারিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সভাপতি লালাজী যখন ভোট গণনা করিলেন, তখন দেখা গেল ৫৮১৪ জন প্রতিনিধি মধ্যে ২৭২৮ জন ভোট ব্যাপারে সংলিপ্ত ছিলেন এবং তন্মধ্যে ১৮৫৫ জন মহাত্মার প্রস্তাবের সমর্থনে এবং ৮৭৩ জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। অধিকাংশ

প্রতিনিধি—অসহযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। সভাপতি মহোদয় মহাত্মাজীর বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিবামাত্র মহাসভা আকুল আবেগে নিনাদিত করিলেন "জয় মহাত্মা গান্ধী কি জয়"। তড়িৎবেগে বিজয় সংবাদ সভা-মণ্ডলের বাহিরে উপস্থিত হইল। তথায় অসংখ্য নর-নারী মহাত্মার বিজয় বার্ত্তা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা মুক্ত-হৃদয়ে ধ্বনিত করিল "জয় মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।" সমগ্র ভারতে মহাত্মার বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।" সুদূর পল্লীতে অর্দ্ধভুক্ত কঙ্কাল-সার পল্লীবাসী এবং নিরাশ্রয়া পল্লীবাসিনী ক্ষণেকের তরে সংসারের দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হইয়া আনন্দে, আবেগে পরমেশ্বরের নিকট সকরুণ প্রার্থনা জানাইলেন "জয় মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!" মনে হইল স্বয়ং প্রকৃতি দেবী সোৎসাহে বীণা লইয়া মধুর ঝঙ্কারে পুনঃ পুনঃ গাহিলেন :—

"জয় মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়।
জয় মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!"

জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মাজীর অসহযোগ নীতি গ্রহণ করায় কতিপয় কংগ্রেস নেতা বড়ই বিপদগ্রস্ত হইলেন। তাঁহারা পূর্ণ অসহযোগ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নবপ্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল সমূহে সভাসদরূপে প্রবেশ করিয়া দেশের মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা করাই প্রশস্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব নহে দেখিয়া তাঁহারা এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। ঝটিতি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের গৃহীত অসহযোগ প্রস্তাব ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও উপর সম্পূর্ণরূপে বাধ্যকর নহে। তাঁহাদের মীমাংসা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল। এরূপ মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও কতিপয় বিশিষ্ট নেতা পূর্ণঅসহযোগের পক্ষপাতী না হইলেও কংগ্রেসের সম্মান রক্ষা

করিতে মনন্ করিলেন। তদনুযায়ী বাংলার শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়, যুক্ত প্রদেশের পণ্ডিত মতিলাল মেহেরু, বোম্বাইএর প্যাটেল মহাশয় এবং মাদ্রাজের মাধব রাও এবং বিজয়রাঘবাচারিয়ার মহাশয়গণ দ্বন্দ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনেকে রাজদণ্ড উপাধি এবং কেহ কেহ চাকুরীও ত্যাগ করিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্ব্বত্র অক্লান্তভাবে অসহযোগ প্রচার করিতে লাগিলেন। কোটি কোটি নরনারীর সমক্ষে তিনি অহিংস-অসহযোগ ব্যাখ্যা করিলেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহাতে একতা ও সখ্য স্থাপিত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা প্রচার করিলেন যে ভারতের জনগণ তাঁহার নীতি অবলম্বন করিলে এক বৎসর মধ্যেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতবাসী তাঁহার কথায় উৎসাহিত হইয়া আগ্রহের সহিত অসহযোগ গ্রহণ করিল।

এই সময় মহাত্মাজী কলিকাতা ও ঢাকা নগর আগমন করিয়া ছাত্রগণকে স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দেশবন্ধু দাস মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই মহাত্মাজীর বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া পূর্ণ অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে আইন ব্যবসায়ে তিনি জীবনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই আইন ব্যবসায় তিনি দেশের আহ্বানে অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্যাগ করিলেন। স্বার্থত্যাগী বীর দেশ মাতৃকার পূজার জন্য জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

মহাত্মাজীর কলিকাতা আগমনের পূর্ব্বেই দাস মহাশয় বঙ্গের স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাত্মার আহ্বানে দেশবাসী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। দলে দলে ছাত্রগণ স্কুল ও কলেজ ত্যাগ করিয়া অসহযোগ পতাকাতলে

সমবেত হইতে লাগিল। অনেকে শঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয়ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু নর-শ্রেষ্ঠ প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী মহাতেজঃ সম্পন্ন কর্ম্মবীর স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন। আশুবাবু বঙ্গে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি সাধন জন্য নিজের ইচ্ছামত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ ছিলেন; তিনি ইহার গুরু ও এক মাত্র নেতা ছিলেন। আশুবাবুর স্বার্থত্যাগ ও কর্ম্মকুশলতা, স্বদেশ-প্রেম ও অপূর্ব্ব বিদ্যানুরাগ এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সুদৃঢ় পরিখা স্বরূপে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করিতেছিল। কাহার সাধ্য সে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাঙ্গিতে পারে? আশুবাবুর জীবিত কালে শুধু ভারতে কেন, সমগ্র পৃথিবীতেও এমন শক্তি ছিল না, যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার জীবনী শক্তিতে পরিপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেহ ক্ষতি সাধন করিতে পারে। শ্রীযুক্ত দাস প্রমুখ অসহযোগী বীরগণ বারংবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আঘাত করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে তাঁহাদিগকে নতশির ভুজঙ্গের মত মস্তক কুঞ্চিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণদ্বার হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। বহুছাত্র প্রথমতঃ স্কুলও কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু গুরুর গুরু পরমগুরু আশুবাবুর প্রাণের আহ্বান অসম্মান করা বীরোচিত কার্য্য নহে বুঝিয়া তাঁহারা পুনরায় দেশ গুরুর পুণ্যময় ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী এই সময় বঙ্গের ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার পরিচালিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'— নামক সংবাদ পত্রে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রখানি এক্ষণে অসহযোগের বাল্যজীবণের একটি পুরাতন স্মৃতির স্বরূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক পত্রখানির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইংরাজী ১৯২১ সাল ১৯শে জানুয়ারী তারিখে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদ পত্রে মহাত্মা গান্ধীর নিম্নলিখিত উপদেশটি প্রকাশিত হইয়াছে—

প্রিয় যুবক বন্ধুগণ,—

সমগ্র জাতির আহ্বানে আপনারা যেরূপ সহৃদয় উত্তর প্রদান করিতেছেন তাহার একটি বিবরণ আমি এইমাত্র পাঠ করিলাম। তাহাতে আপনাদের ও বঙ্গদেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনারা যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন আমি আপনাদের নিকট তদপেক্ষা কম সহানুভূতি পাইবার কখনও আশা করি নাই। সত্য সত্যই আমি আপনাদের নিকট এতদপেক্ষা অনেক অধিক সহানুভূতি পাইবার আশা করিতেছি। বঙ্গদেশের জ্ঞান ও বোধ শক্তি উচ্চধরণের বটে। ইহার অন্তঃকরণ আরও উচ্চ। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে যে আধ্যাত্মিক উন্নতি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে উন্নতির জন্য আমাদের দেশ বিশেষভাবে সুবিখ্যাত, সেই অধ্যাত্মিকতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশেই সমধিক বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় আপনাদের বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক মহাপুরুষ আছেন। অন্যান্য ভারতবাসীর তুলনায় আপনাদের চিন্তাশক্তি অনেক অধিক এবং আপনাদের মনোবৃত্তি অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। আপনাদের উপর যে ভীরুতার অপবাদ আরোপ করা হইত সে অপবাদ আপনারা বহুবার বহুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বঙ্গবাসীই সমগ্র ভারতে নেতা ছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আপনারাই নেতাস্বরূপে সমগ্র ভারতকে পরিচালিত করিবেন। আপনাদের নেতৃত্ব না করিতে পারিবার কোন কারণ ঘটে নাই। আপনারা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন!

আপনারা পদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিবার যথেষ্ঠ সময় পাইয়াছেন ; বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আপনারা যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছেন। আপনারাই জাতীয় মহাসভার আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সেই সভা সমগ্র ভারতকে সহযোগিতা বর্জ্জনের মন্ত্র বা বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন। এই সহযোগিতা বর্জ্জনের ফলে সমগ্র জাতির আত্মা পবিত্রীকৃত হইবে। সমগ্র ভারতবাসী স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করিবে এবং তাহাদের হৃদয়ে সৎসাহস এবং আশার উদয় হইবে। এই মহাসভা প্রথম যে বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছিলেন, সেই বার্ত্তা নাগপুরের কংগ্রেস বা মহাসভা কর্ত্তৃক পুনর্ব্বিবেচিত হইয়া অনুমোদিত, নির্ম্মলীভূত এবং পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা বর্জ্জনের বার্ত্তা প্রথমতঃ দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও অনৈক্যের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও অনৈক্য সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইয়াছে, এবং অসহযোগের বার্ত্তা এক্ষণে ভারতে আনন্দ, উৎসাহোচ্ছ্বাস এবং কার্য্যতঃ পূর্ণ ঐক্যমতের মধ্যে পুনর্বিঘোষিত হইয়াছে ঐ বার্ত্তা গ্রহণ না করিবার বা তাহা গ্রহণ করিতে সন্দেহ করিবার আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু আপনারা সন্দেহ না করিয়া তাহা সঠিক ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নীতি অনুসারে আপনাদের অবলম্বিত পন্থা বিশেষ সাবধানতাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, আমার মনে হয় আপনারা অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। আপনারা আর এই পন্থা হইতে ফিরিয়া যাইতে সাহস করেন না; কারণ এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আপনাদের নিজেদের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইবে এবং ভারতের স্বরাজ স্থাপনের পথে কণ্টক পড়িবে।

বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এই পাশ্চাত্য শিক্ষা

আমাদের দেশে একটি ভয়ঙ্কর কুহক বিস্তার করিয়াছে এবং সেই কুহকের ফলেই অনেকে সহযোগিতা বর্জ্জনের পন্থা ফলপ্রদ না হইতেও পারে এরূপ ভয় করিতেছেন। যদি আমরা মুগ্ধ না হইতাম তাহা হইলে কখনই আমরা এই পন্থার সততা ও শক্তিতে সন্দিহান হইতে পারিতাম না। বুঝিয়া দেখুন, যে সকল ব্যক্তিগণ আরববাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, সেই সকল ব্যক্তিগণের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত পাঠাগার সমূহে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নির্ভীক আরববাসী কি তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে? তাহাদের দেশের আক্রমণকারী শত্রুগণের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয়ে যদি নির্ভীক আরবগণের শিক্ষা লাভ করিবার উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরবগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আরবগণের কর্ত্তব্য পথ হইতে কি আমাদের কর্ত্তব্য পথ ভিন্ন, আর যদি ভিন্নই হয়, তবে আমরা, যে গভর্ণমেণ্টকে ন্যায়তঃ বা অন্যায়তঃ নিজের ইচ্ছার অনুযায়ী করিতে না পারিলে, ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি সেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত স্কুলসমূহের সংস্রব ত্যাগ করা কি আমাদের আরও অধিকতর কর্ত্তব্য নহে?

আমাদের কোন শ্রেণীর লোকেই যদি স্বরাজের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে এবং কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে আমরা স্বরাজ লাভ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। বাক্যের যুক্তির নিকট গবর্ণমেণ্ট কখন পরাজয় স্বীকার করিবেন না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট নির্ভীক ও সৎকার্য্যের যুক্তিকেই একমাত্র যুক্তি বলিয়া জ্ঞান করেন।

তরবারি পরিচালনার নির্ভীকতা গবর্ণমেণ্ট বেশ জানেন এবং আমরা যে তরবারি পরিচালনা দ্বারা তাঁহাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারিব না,

তাহা বুঝিয়াই, তাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন। আমাদের পক্ষ হইতে বল প্রয়োগ করা হইলে, অনেক রাজকর্ম্মচারী আনন্দিত হইবেন। কারণ তাঁহারা অপরাজেয়; নির্ভীকচিত্তে বিদ্রোহীদিগের সম্মুখীন হইয়া বিদ্রোহ দমন করিতে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। সুতরাং বলপ্রয়োগ দ্বারা আমরা কোন ক্রমেই গবর্ণমেণ্টকে আমাদের ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে পারিব না এরূপক্ষেত্রে আমরা প্রস্তাব করি যে আমরা কোন কারণেই কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করিব না এবং তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্টের বলপ্রয়োগের শক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। (অভিজ্ঞতার ফলে জগৎ ইহা স্পষ্টই বুঝিয়াছে যে) কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে, আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আক্রমণকারীর প্রতি বল প্রয়োগ না করে তাহা হইলে আক্রমণকারীর বল প্রয়োগের শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রকারের বল প্রয়োগ হইতে বিরত থাকাই হইতেছে সহযোগিতাবর্জ্জনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি। সুতরাং আপনাদের সহিত যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিবার সময়, আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করিবেন এবং কোন প্রকারে হঠকারিতা প্রদর্শন করিবেন না; তাঁহাদের মন ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, জিদের বশবর্ত্তী হইয়া আপনারা এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না। অসহিষ্ণুতা বা অসহনশীলতার কার্য্য করিলে এক প্রকার বল প্রয়োগের কার্য্যই করা হয়; সুতরাং তাহা সহযোগিতা বর্জ্জন নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সম্পূর্ণরূপে বলপ্রয়োগ হইতে বিরত থাকিয়া শাসক সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতাবর্জ্জন করাই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রকৃত দৃষ্টান্তমূলক উপদেশ। তাহাই প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী শিক্ষার মূল মন্ত্র। যে মূহুর্ত্তে আমরা নিশ্চিত হইতে পারিব যে আমাদের ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও কোন প্রকারের বলপ্রয়োগ করিবে না, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে হইবে যে আমাদের উদ্দেশ্য

সফল হইয়াছে ; তাহার কারণ সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে সক্ষম হইব।

আমি বলি আমি যে প্রস্তাব এইমাত্র উপস্থিত করিলাম, তাহা শুনিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। মানবজাতির অভ্যুত্থান বা পতন পাটিগণিতের কোন বিধিবদ্ধ ক্রম অনুযায়ী সম্পাদিত হয় না ; এমন কি, তাহা জ্যামিতিক কোন ক্রমের ও অনুবর্ত্তী নহে। ইহা বিদিত আছে যে একটি সমগ্র জাতি একদিনের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, আবার ইহাও বিদিত আছে যে একটী সমগ্র জাতির অভ্যুত্থান একদিনের মধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। ত্রিশ কোটি মানব তাহাদের যে শক্তি আছে তাহা যদি তাহারা বুঝিতে পারে এবং অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যে সেই শক্তির পরিচালনা না করিয়াই স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে, ইহা ভারতের পক্ষে উপলব্ধি করা কি এতই দুরূহ ব্যাপার ? আমরা ইতঃপূর্ব্বে জাতীয় চৈতন্য লাভ করিতে পারি নাই বলিয়াই, শাসক সম্প্রদায় এতকাল আমাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে চালিত করিতেছিলেন। আমরা আর এক্ষণে আমাদিগকে সেরূপভাবে চালিত করিতে দিব না, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা আর পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। এবং তাহা যদি করি, তবে ইহা নিশ্চিত যে আমরাই আমাদের দেশে কর্তৃত্ব করিব, শাসক সম্প্রদায় আমাদের দেশে কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না।

যে সকল জনশ্রেণী সহজেই অভিভূত হয়েন, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা সেই নীতির প্রভাবে বিদ্যাশিক্ষার্থী যুবকগণের ন্যায় প্রলুব্ধ হইয়া পাশ-বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সকল সরল প্রাণ জনশ্রেণীকে লইয়া সহযোগিতা বর্জ্জনরূপ আন্দোলনে প্রথমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। (এই সকল সহজে অভিভূতিশীল জনগণের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেষ্টা প্রথমেই

কর্ত্তব্য) যখন আমরা এই বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করি তখন বেশ বুঝিতে পারি যে ব্যক্তিগতভাবে আমাদিগকে যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে সেই স্বার্থত্যাগের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ; কারণ ভারতের উন্নতি কল্পে যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে সে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ আমাদের মধ্যে কাহাকেও একা করিতে হইবে না ; আমাদের সকলে মিলিয়া একযোগে সেই আবশ্যকীয় পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে। এক বৎসরের জন্য বা যতদিন ভারতে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিনের জন্য আপনারা বিদ্যাভ্যাস হইতে বিরত থাকিবেন, এই ত্যাগটুকু মাত্র আপনাদিগকে করিতে হইবে। আমি বেশ জানি যে আমি যদি সমগ্র ছাত্র সমাজ মধ্যে আমার নিজের গভীর বিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিতাম, তবে এমন কি এক বৎসরের জন্যও ছাত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস স্থগিত রাখিতে হইত না।

আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা পাঠাভ্যাসের পরিবর্ত্তে এই ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তির বৎসরের মধ্যেই যতদূর সম্ভব ধীর ও শান্তভাবে কিরূপে ভারতে 'স্বরাজ' আনয়ন করা যাইতে পারে তাহার প্রণালী শিক্ষা করিতে রত হউন। আমি আপনাদিগকে সূত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্র 'চরকা' প্রদান করিতেছি এবং আপনাদিগকে ইহা জানাইয়া দিতেছি যে এই 'চরকা' দ্বারাই ভারতের অর্থ কষ্ট বিমুক্ত হইবে॥

কিন্তু যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তবে এই 'চরকা' আপনারা গ্রহণ না করিতে পারেন, এ বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আপনারা 'চরকা' ত্যাগ করিয়া, দাশ মহাশয় (শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ) আপনাদের জন্য যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছেন, আপনারা সেই কলেজে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবেশ করিতে পারেন। গুজরাট প্রদেশে যে জাতীয় কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে সেই কলেজের অধিকাংশ ছাত্রগণ

দৈনিক অন্ততঃ চারি ঘণ্টা করিয়া নিজদিগকে সূত্র প্রস্তুত করণ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবেন স্থির করিয়াছেন। সূত্র প্রস্তুতকরণরূপ একটি সুন্দর শিল্প শিক্ষা করা এবং সেই শিক্ষা দ্বারা নগ্ন ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করিতে সক্ষম হওয়া এমন কিছু কষ্টকর স্বার্থত্যাগের কার্য্য নহে। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত কলেজসমূহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনারা যে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিরূপে কার্য্য করিলে আপনারা অতি সহজে বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন আমি তাহারই উপায় দেখাইয়া দিতেছি।

আপনারা যাহাতে নিজেদের সংকল্পে অবিচলিত থাকেন তজ্জন্য পরমেশ্বর আপনাদিগকে শক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করুন। ইহাই আমার প্রার্থনা।

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,

এম, কে, গান্ধী।

স্কুল ও কলেজ বয়কট এবং আদালত বয়কটের প্রস্তাব সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও, ভারতবাসী কোনও প্রকার উপদ্রব সৃষ্টি না করিয়া অসহ-যোগের অন্যান্য প্রস্তাব সমূহের সমর্থনে ধীরভাবে কার্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অনেকটা সৌহার্দ্দ্য ও একতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। গান্ধীজী উৎসাহিত হইয়া আইন অমান্য আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ কর্তৃপক্ষের নিষেধ করার ফলে, ময়মনসিংহে উপস্থাপিত হইয়াও নগরে প্রবেশ করিতে না পাইয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনিও আইন অমান্য প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আলি ভাইগণ ভারতের সর্ব্বত্র তীব্র ভাষায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছিলেন। কর্তৃপক্ষের শঙ্কা

হইয়াছিল যে আলি ভাইগণের বক্তৃতার ফলে ভারতে অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ আলি ভাইগণকে সংশোধন করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। ঠিক এইরূপ সময়ে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত প্রধান বিচারপতি এবং অদ্বিতীয় রাজনীতিবেত্তা পণ্ডিত লর্ড রেডিং মহামহিম সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে ভারতে আসিয়া ভারত সাম্রাজ্য সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিবামাত্র তাঁহার সহিত যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতজী এই সময় মহাত্মাকে দিল্লী আসিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট আলি ভাইগণের উগ্র বক্তৃতার জন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করিবার পরামর্শ করিতেছেন; কিন্তু মহাত্মাজী যদি আলি ভাইগণকে বলিয়া এইরূপ লিখিত একরার দেওয়া করান যে ভবিষ্যতে আলি ভাইগণ হিংসার উদ্দীপক বক্তৃতা করিবেন না, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের উপর এক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন না। পণ্ডিত মালব্যজী মহাত্মাকে এই সম্পর্কে বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা বড়ই সংশয়ের মধ্যে পড়িলেন। তিনি অসহযোগী। বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করা বা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতিলাভের একরারনামা লিখিয়া দেওয়া অসহযোগের সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধীজী এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু আবার ভাবিলেন ভারতের বহুদর্শী নেতা পণ্ডিত মালব্যজী দেশের মঙ্গলের জন্যই আলি ভাইগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলেন আলি ভাইগণের ন্যায় নির্ভীক ও ত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি ভারতে সুদুর্লভ। তাঁহারা অসহযোগের প্রাণ এবং সমগ্র জাতির শক্তিস্বরূপ। জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া

তাঁহারা আজীবন দেশ হিতে রত আছেন, দেশের জন্য বারংবার তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী বন্ধন ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে ভক্তি করেন। নিজের প্রাণ অপেক্ষাও তিনি তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। আলি ভাইগণ এ সময় বন্দী হইলে, ভারত শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। গান্ধীজী তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাকে চিন্তা করিবার অবকাশ দিলেন না। পণ্ডিত মালব্যজী 'জরুরী' টেলিগ্রাম পাঠাইয়া মহাত্মাকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। মহাত্মাজী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সরলতা, তাঁহার নম্রতা, তাঁহার ত্যাগের স্পৃহা, তাঁহার বীরত্বপূর্ণ স্বভাব এবং অহিংস-অসহযোগের অমরত্বে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহাকে আর কাল বিলম্ব করিতে দিল না। গান্ধীজী টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্রেই দিল্লী গমন করিলেন এবং পণ্ডিত মালব্যজীর সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক কথোপকথন হইল। অবশেষে মহাত্মাজী মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে পত্র প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বেই তিনি সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন॥

গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিশ্ববিজয়ী রাজনীতিকুশল লর্ড রেডিং মহোদয়ের সহিত শিশুর ন্যায় সরল সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর সম্মিলন হইল। উভয়ের মধ্যে প্রায় তিনদিন ধরিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা হইল। উভয়ের সম্মতি অনুসারে সে আলোচনা গোপন রাখা হইয়াছিল। সে আলোচনার বিষয় জন-সাধারণ কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। তবে দেশের তদানীন্তন অবস্থা এবং অসহযোগ আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা অভ্রান্তরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই আলোচনার ফলে গবর্ণমেণ্ট আলি ভাইগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন। আলি ভাইগণ একরার দিয়াছিলেন যে

তাঁহারা কখন হিংসা প্রচার করেন নাই এবং বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসা প্রচার করিবার তাঁহাদের কোন ইচ্ছা নাই।

অহিংস অসহযোগ নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বিস্তৃত লাভ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ এই আন্দোলনে কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই। এমন কি, অসহযোগিগণের বক্তৃতা আপত্তিজনক হইলেও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তাগণকে নীতিসঙ্গত উপায়ে বাধা প্রদান না করিলে দেশের মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইবে এবং নানারূপ উপদ্রব সংঘটিত হইয়া দেশের শান্তি নষ্ট হইবে। তদনুযায়ী তাঁহারা কোন বক্তা রাজদ্রোহিতাসূচক কোন কথা বলিলে বা শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে এরূপ উত্তেজক বক্তৃতা প্রদান করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আইন অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জগতের বহুস্থানে বহু অসহযোগী গ্রেপ্তার হইলেন। কিন্তু অসহযোগিগণ সাধারণতঃ কেহই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহা নির্ভীকভাবে বিচারকের সমক্ষে স্বীকার করিয়া সানন্দচিত্তে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা গান্ধী মনে করিলেন দেশ ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে হিংসা বর্জ্জিত হইতে পারিয়াছে। তিনি ভাবিলেন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম বর্দ্দোলীতে আইন অমান্যের ব্যবস্থা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার অল্পদিন পরেই ভারতের স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর উপদ্রবের সৃষ্টি হইল। মহাত্মাজী বুঝিলেন দেশ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ভারতবাসী হিংসা

ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিলেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্রচেতা ভারত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিবস প্রথম বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিলেন সেই দিবসেই বোম্বাই সহরে একটী ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গেল।

গান্ধীজী বর্দ্দোলীর আইন অমান্যের সংকল্প স্থগিত রাখিলেন। আবার কিছুকাল পরে চৌরিচোরা নামক স্থানে ভারতবাসিগণের সহিত স্থানীয় পুলিশের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কতিপয় দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক পুলিশ-থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থানা লুণ্ঠন করিল এবং রাজকর্ম্মচারিগণকে গুরুতররূপে আহত করিল। কাহারও কাহারও প্রাণনাশ ঘটিল। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহুব্যক্তি আহত হইয়াছিল। মহাত্মাজী দেশবাসীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি আন্দোলনের প্রথম হইতেই উপদেশ দিয়াছিলেন যে অসহযোগী কোন কারণে বিপক্ষের উপর বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না. এমন কি অসহযোগীর উপর অযথা অত্যাচার করা হইলেও অসহযোগীকে তাহা ধীরভাবে সহ্য করিতে হইবে। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রথম হইতেই তিনি ইহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ভারতবাসী সম্পূর্ণরূপে অহিংস হইতে না পারিলে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন কোন ক্রমেই প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। হিংসা ত্যাগ না করিলে, আইন অমান্যে দেশের ইষ্ট না হইয়া সমূহ অনিষ্টই সাধিত হইবে। কারণ আইন অমান্য করিলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া বাধা প্রদান করিবেন এবং আইন অমান্যকারিগণকে যথোচিত শাস্তি দিবেন। ভারতের জনগণ যদি সম্পূর্ণরূপে অহিংস না হয় তবে সে অবস্থায় তাহারা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে পারে। এবং সেরূপ করিলে দমন নীতি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া প্রবল শক্তি-

সম্পন্ন শাসন সম্প্রদায় অনায়াসেই জনগণকে শাসিত ও দমিত করিতে পারিবেন। ইহার ফলে দুর্ব্বল ভারতবাসী ক্রমশঃ আরও শক্তিহীন হইয়া পড়িবে। বহুবর্ষ পরে ভারতে যে মনুষ্যত্বটুকু বিকাশোন্মুখ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধস্ত হইবে। ভারত বহুবর্ষের জন্য আবার পিছাইয়া পড়িবে। মনস্বী নেতা বারংবার যুক্তকরে একথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশবাসিগণ তাঁহার অহিংস নীতির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। গান্ধীজী চৌরীচৌরার ব্যাপারে কাতর হইয়া পড়িলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তিনি কঠোর অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন। তৎপরে জনসাধারণকে দৃঢ়স্বরে জ্ঞাপন করিলেন যে দেশ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই এবং তজ্জন্য আইন অমানোর কল্পনা পর্য্যন্ত এক্ষণে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মহাত্মাজী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করিয়া বর্দ্দোলিতে কয়েকটি অভিনব প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই অভিনব প্রস্তাব সমূহে মহাত্মার অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, অনেকে এইরূপ সন্দেহ করিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় নাই। অন্যান্য নেতাগণ মহাত্মার অহিংস-নীতি কখনই প্রকৃষ্টরূপ বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই এবং সেইজন্যই তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর বর্দ্দোলীর প্রস্তাব গুলির মর্ম্ম এই যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রযুক্ত হইতে পারে না। যত দিন পর্য্যন্ত দেশবাসী সম্পূর্ণরূপে অহিংস হইতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আইন অমান্য বর্জ্জিত হইবে। এক্ষণে যাহাতে ভারতবর্ষের দৈন্য বিদূরিত হয়, জন সাধারণের অন্ন সংস্থানের সুব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মহাত্মাজী পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত প্রকাশ করিলেন যে 'চরকার' আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভারতের দীনতা যাইয়া :ভারত ক্রমশঃ

সমৃদ্ধিশালী হইবে। এইজন্য তিনি দেশ বাসীকে ধীর ও শান্তভাবে চরকার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত করিবার এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে এরূপ সকল কার্য্য হইতে বিরত থা কবার উপদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু দেশ মহাত্মাজীর নূতন প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করিল না। অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন। মনে হইল যেন দেশ প্রস্তাব সমূহের শক্তিমত্তায় সন্দিহান হইয়াছে। তীক্ষ্ণদর্শী রাজনীতিবেত্তা স্থির করিলেন ভারতে মহাত্মার শক্তি হ্রাস হইল। দুর্ভাগ্য ভারত নিজ কর্ম্মদোষে আবার বহুবর্ষের জন্য পিছাইয়া পড়িল। জীবন্ত সত্যের অবমাননা করিলে, ঈশ্বর প্রেরিত শক্তির অবমাননা করিলে, দেবত্ব অপেক্ষা মহত্তর মনুষত্বে অবিশ্বাস করিলে, যে মহাপাপ সংঘটিত হয়, দাম্ভিক, 'অকৃতজ্ঞ, এবং অসংযত ভারত মুহূর্ত্তের চাঞ্চল্যে মানব-সভ্যতা ও বিশ্বমানবের বিরুদ্ধে সেই মহাপাপের অনুষ্ঠান করিল। একবার চাহিয়া দেখিল না ভারত, মহাত্মার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, অভিনব প্রস্তাব সমূহের অপূর্ব্ব শক্তি সে বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। যে গান্ধী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই জননীর স্তন্যে দেশ মাতৃকার স্নেহসুধা পান করিয়াছিলেন, শৈশবে ও বাল্যে যে গান্ধী অনন্যমনা হইয়া জন্মভূমির পবিত্র মূর্ত্তি নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, কৈশোরে যিনি বিদেশে নানা প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও অবিচলিত চিত্তে ধ্যানযোগে দেশমাতার চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন, যৌবনে যিনি ভোগলালসা ত্যাগ করিয়া, পার্থিব জীবনের সমস্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দ পদদলিত করিয়া স্বদেশের সেবা করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বারংবার প্রফুল্ল হৃদয়ে ও সোৎসাহে দুর্ব্বিসহ কারা ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়ে যিনি অকাতরে হৃদয়ের রক্তটুকু পর্য্যন্ত দেশমাতার চরণে উপহার দিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই এবং প্রতি-

মূহূর্ত্তে দেশ বাসীর মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনটিকে জন্মভূমির চরণে বলিপ্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, এই অসাধারণ মহাপুরুষ এই নিঃস্বার্থ দেশগত প্রাণ গান্ধী বহুদিনের সুপ্ত ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যখন আন্দোলন দ্বারা উত্তেজনার সৃষ্টি করিলেন, তখন নব জাগ্রত ভারত পূর্ণ উদ্যমে মহত্মার জয় ঘোষণা করিয়া মহাত্মার গলে জয়মাল্য পরাইয়াছিল কিন্তু যখন কর্ম্মী গান্ধী দেশের মধ্যে কর্ম্মশক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তেত্রিশ কোটি নর-নারীকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে একটী অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য কয়েকটি নীতিমূলক প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন তখন চির অলস অভিশপ্ত ভারত গান্ধীর পবিত্র উপদেশ পালনে অসম্মত হইয়া অলীক যুক্তি তর্কের সাহায্যে পুনরায় স্বেচ্ছায় মোহান্ধকারে প্রবেশ করিল। হতভাগ্য নবীন ভারত উপদেশ দিতে শিখিয়াছিল কিন্তু সেই উপদেপ পালন করিতে শিখে নাই।

মহাত্মা পুনরায় সকাতরে দেশবাসীকে জানাইলেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় চরকাই স্বরাজ লাভের এক মাত্র উপায়; একমাত্র চরকার সাহায্যেই ভারতে স্বরাজ আসিবে। কিন্তু মহাত্মাজী আর অধিক দিন কার্য্য করিবার সুযোগ পাইলেন না। ইতঃপূর্ব্বেই বিলাতের বহুব্যক্তি মহাত্মাজীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে মহাত্মাকে বন্দী করিবার প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ভারত সরকারও ক্রমশঃ মহাত্মার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী অভিযোগ উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। তেত্রিশ কোটি মানবের গুরু ও নায়ক অহিংস মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক, সত্য ও সরলতার জীবন্তমূর্ত্তি গান্ধী শীঘ্রই গ্রেপ্তার হইলেন। আহম্মদাবাদের দায়রা আদালতে তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মী ব্যাঙ্কারমহাশয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহিতা অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারের দিন আদালত গৃহ সহস্র সহস্র লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সরকার পক্ষের শিক্ষিত এড্ভোকেট জেনারেল মহাশয় গান্ধীজীর পূর্ব্বের লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতার কতকগুলি অংশ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে আসামিগণ ১২৪ক ধারা অনুসারে অপরাধী হইয়াছেন। মহাত্মাজী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন না। জনসাধারণের নিকট তিনি কেবল একটি লিখিত বর্ণনা পত্র পাঠ করিয়াছিলেন এবং বর্ণনা পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি কথা ভূমিকা স্বরূপ জজ মহোদয়ের সমক্ষে বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমি আমার বর্ণনা পত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে স্পষ্টভাবে বলিতে ইচ্ছা করি যে শিক্ষিত এ্যাডভোকেট জেনারেল মহাশয় আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। আমার বিবেচনায় আমার সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি সমূহ ন্যায্য হইয়াছে। কারণ ইহা সত্য, এবং এই তথ্য আদালতের সমক্ষে গোপন করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, যে বর্ত্তমানে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি করা আমার একটি প্রবল অনুরাগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি অসন্তোষ প্রচার করিয়া আসিতেছি। বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং চৌরিচৌরাতে যে সকল দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এ্যাডভোকেট জেনারেল মহাশয় আমার যে সকল নিন্দাবাদ করিয়াছেন, আমি সে নিন্দাবাদ সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছি। এই সকল বিষয় দিবারাত্র গভীরভাবে চিন্তা করিয়া এবং আমার অন্তঃকরণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমি ইহাই স্থির করিয়াছি যে বোম্বাই বা চৌরিচৌরার পৈশাচিক ও উন্মত্ত অত্যাচার গুলির জন্য আমিই প্রকারান্তরে দায়ী। ঐ সকল ব্যাপারের সংঘটন হইতে আমি নিজকে বিচ্ছিন্ন ভাবিতে

পারি না। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন, উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা-প্রাপ্ত এবং সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কার্য্যের ফলাফল বুঝিয়া কার্য্য করা উচিত, এবং সে হিসাবে প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল বুঝিয়া আমারও কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। আমি যখন আমার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম তখন আমি জানিতাম যে অগ্নির সহিত খেলা করিতেছি। আমার দায়িত্ব বুঝিয়াই আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, এবং আমাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে আমি এখনও তাহাই করিব। যদি আমি তাহা না করি, তবে আমার মনে হয়, আমি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইব। আমি অন্ত প্রাতে অনুভব করিয়াছিলাম যে আমি এই দণ্ডে এই স্থলে যাহা বলিলাম, তাহা যদি আমি প্রকাশ করিয়া না বলি, তবে আমার কর্ত্তব্য ঠিক করা হইবে না। আমি হিংসা এবং বল-প্রয়োগকে পরিহার করিবারই মনন করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, অহিংসাই আমার অবলম্বিত নীতির মূল সূত্র। কিন্তু আমাকে দুইটি পথের মধ্যে একটী পথ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে শাসন-পদ্ধতির ফলে আমার দেশের অসংশোধনীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, হয় আমাকে সেই প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিকে ন্যায্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হয়, কিংবা আমার দেশবাসিগণ আমার মুখে সত্যের তথ্য অবগত হইলে তাহাদের হৃদয়ে যে উত্তেজনা ও উন্মত্ততার সৃষ্টি হইতে পারে, সেই উন্মত্ততার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই দুইটীর মধ্যে একটির দায়িত্ব গ্রহণ করা ভিন্ন আর আমার গত্যন্তর ছিল না। আমি জানি আমার দেশবাসিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য আমি গভীরভাবে দুঃখিত হইয়াছি। এবং সেই কারণেই লঘু দণ্ডের জন্য নহে, কঠোরতম দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য এস্থলে আমি সমুপস্থিত হইয়াছি। আমি দয়ার প্রার্থনা করিতেছি না। আমি আমার অপরাধকে

লঘু করিবার উদ্দেশ্যে কোন দোষ-প্রশমক কার্য্যের উক্তি করিতেছি না। আমার যে কার্য্য প্রচলিত আইনে জ্ঞান-কৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, আমি সেই কার্য্যকে প্রত্যেক মানবের জীবনের উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রচলিত আইন মতেই আমার কার্য্যের বিচার হইবে। এই জন্য এই আইনে যতদূর কঠোর দণ্ড আমার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কঠোর দণ্ড আমি প্রার্থনা করিতেছি, এবং আমি তাহা সানন্দে গ্রহণ করিব। জজ মহোদয়! আপনার কর্ত্তব্য পথ পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। হয় আপনি নিজের জজিয়তি পদে ইস্তফা দেন, না হয়, যদি আপনি প্রচলিত আইন-পদ্ধতিকে সাধারণের মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করেন, তবে সেই আইনে যতদূর কঠোর দণ্ড আমাকে দেওয়া যাইতে পারে, ততদূর কঠোর দণ্ডের বিধান করুন। অবশ্য আপনি প্রচলিত আইন সম্বন্ধে আমার মতাবলম্বী হইয়া জজিয়তি পদ পরিত্যাগ করিবেন, আমি এরূপ আশা করিতে পারি না। কিন্তু আমার লিখিত বর্ণনা পত্র পাঠ করা হইলে, আপনি কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন যে কি একটা ভাব আমার হৃদয়কে তীব্রভাবে আলোড়িত করিতেছে, এবং কেন আমি প্রকৃতিস্থ মানব হইলেও উন্মত্তের ন্যায় কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।”

এই কয়েকটি কথা বলিয়া মহাত্মা তাঁহার লিখিত বর্ণনা পত্রটি পাঠ করিলেন। তাঁহার বর্ণনা-পত্রের মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমি প্রথমতঃ বিশ্বস্ত রাজভক্ত প্রজা ও সহযোগী ছিলাম কিন্তু পরে আমি তীব্র অসহযোগী হইয়াছি এবং গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করিতেছি। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি আমার দেশবাসীকে তাহা বুঝাইয়া বলা আমার কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের জনসাধারণকেও ইহা বলিতে হইবে; কারণ ইংরাজ সাধারণকে শান্ত করিবার জন্যই আমার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে। আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারত গবর্ণ-

মেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করার অপরাধ কেন আমি স্বীকার করিলাম, তাহা আদালতকেও আমার নিবেদন করা কর্ত্তব্য।

ইং ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা দেশে, বহুবিধ অশান্তি ও অসুবিধার মধ্যে আমি প্রথমে আমার জীবনকে সাধারণের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তথায় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমার প্রথম পরিচয় সুখজনক হয় নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মানুষ হিসাবে ও ভারতবাসী হিসাবে আমার কোন অধিকারই নাই। অপরন্তু আরও বুঝিয়াছিলাম যে আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়াই আমার মানুষ হিসাবেও কোন অধিকার নাই।

কিন্তু আমি সেরূপ বুঝিয়াও হতাশ হই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ শাসন পদ্ধতি সভাবতঃ ভালই বটে। তবে ভারতবাসীর প্রতি উক্তরূপ ব্যবহার প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির একটি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রশংসনীয় ত্রুটি মাত্র। এই ভাবিয়া আমি সরকারের কার্য্যে আন্তরিকতার সহিত সহযোগ করিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য দোষ-জনক বিবেচিত হইলে, আমি তাহার সমালোচনা করিতাম বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার কামনা কখনও করি নাই। ইং ১৮৯৯ সালে ভীষণ বুয়র যুদ্ধকালে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, আমি তখন আহত ইংরাজ সৈন্যগণকে রণক্ষেত্র হইতে তৎপর স্থানান্তরিত করিবার জন্য একটি স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী তৈয়ার করিয়াছিলাম, এবং লেডিস্মিথ্ দুর্গ উদ্ধার কালে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া আমার বাহিনীর সাহায্যে আহত সৈন্যগণের সেবা করিয়াছিলাম। আবার ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জুলুগণ যখন ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, আমি তখন উক্তরূপ আর একটি বাহিনী নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসাহায্যে বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সাম্রাজ্যের সেবা করিয়াছিলাম। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমি পদকাদি

পুরস্কার পাইয়াছিলাম এবং গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে আমার কার্য্য সমূহ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আমার উক্ত কার্য্যের জন্য ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে স্বর্ণ-নির্ম্মিত কাইসর্-ই-হিন্দ্ পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইং ১৯১৪ সালে ইংলণ্ড ও জর্ম্মানী মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তৎকালে যে সকল ভারতীয়গণ লণ্ডনে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আহত সৈন্যগণের সেবার্থ আমি একটি বাহিনী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, এবং সেই বাহিনীর অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা সাম্রাজ্যের উপকার সাধিত হইয়াছিল। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপরে ইংরাজী ১৯১৭ সালে, আমার ভারতবর্ষে উপস্থিত কালে, বড় লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বাহাদুর যখন ভারতীয়গণকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য আহ্বান করেন, আমি তখন নিজের স্বাস্থ্যের হানি করিয়াও কঠোর পরিশ্রম সহকারে খেদাতে একটি সৈন্যদল গঠন করিতেছিলাম, এবং সৈন্যও অনেক সংগৃহীত হইতেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায়, আর অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আমি যে এরূপ যত্নের সহিত সাম্রাজ্যের সেবা করিতেছিলাম, তাহার কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এইরূপ সেবা দ্বারা সুনিশ্চিত আমার দেশবাসিগণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের প্রজাগণের ন্যায় অধিকার সমূহ প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু পরে আমার ভ্রান্তি আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কর্ত্তৃপক্ষ রাউলাতে আইন যখন পাশ করিলেন, তখন আমার প্রাণে একটা বিষম আঘাত লাগিল। আমি বুঝিলাম, এই আইনের ফলে আমার দেশবাসি-গণের ব্যক্তিগত অধিকার সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। পরক্ষণেই আবার পঞ্জাবে এক ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল—জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই নরহত্যা, ভারতবাসিগণকে হুকুম দিয়া বুকে হাঁটান, প্রকাশ্য স্থলে

তাহাদের উপর বেত্রাঘাত ; ইহা ছাড়া আরও বহু অপমান-সূচক ব্যবহার ভারতবাসীর উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল। সে অপমানের কথা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আবার, অপরদিকে দেখিলাম, তুরস্কের ও মহম্মদীয়-গণের তীর্থস্থান সমূহের সম্মান ও পূর্ণতা রক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ভারতের মুসলমানগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইবার বিশেষ কোন আশা নাই। কিন্তু তথাপি ইং ১৯১৯ সালে অমৃতসহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে, আমার বন্ধুগণ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড উদ্ভাবিত নূতন শাসন সংস্কার ভারতের পক্ষে শুভ-জনক হইবে না বলিয়া সন্দেহ করিলেও, এবং তাহা গ্রহণ সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না, এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া যাহাতে নূতন শাসন-সংস্কার ফলবান করিতে পারা যায়, তজ্জন্য প্রাণপণ-যত্ন করিলাম। মনে ভাবিলাম হয়ত সহযোগিতার ফলে, প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ভারতীয় মুসলমানগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সে প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন, পঞ্জাবের অন্তরে যে বেদনা লাগিয়াছে, হয়ত সে বেদনার তিনি উপশম করিয়া দিবেন, এবং এই নূতন শাসন সংস্কার, যদিও ইহা যথেষ্ট ও সন্তোষ-জনক নহে, তথাপি হয় ত ইহা ভারতের জাতীয় জীবনে নবীন আশার একটি নবীন যুগ প্রবর্ত্তিত করিবে।

কিন্তু আমার সব আশা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। খিলাফৎ প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল না ; পঞ্জাবের অত্যাচার প্রকারান্তরে সমর্থিত হইল ; অধিকাংশ অপরাধীর দণ্ড হইল না,কাহারও কাহারও চাকুরীও বাজায় রহিল, এবং কাহাকেও বা ভারতের তহবিল হইতে পেন্‌শন দিবার ব্যবস্থা হইল। আর শাসন-সংস্কার ? আমার মনে হইল, উহা নিতান্ত অসার, উহার, প্রবর্ত্তনে পূর্ব্বের অবলম্বিত শাসন-নীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত



পত্নীসহ মহাত্মাজী

হয় নাই। বরঞ্চ আমার মনে হয়, এই সংস্কারের ফলে ভারতের দীনতা বৃদ্ধি পাইবে, এবং ভারত স্বাবলম্বনের শক্তি হারাইয়া আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

ইংরাজ শাসনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকা হেতু, আমার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, ক্রমশঃ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে ইংরাজ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার পর, ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও আর্থিক হিসাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের পক্ষে স্বেচ্ছা-মত অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায়, ভারত হীনবীর্য্য হইয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে, বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিবার তাহার শক্তি নাই। ভারত এতই দুর্ব্বল হইয়াছে যে আমাদের দেশের কোন কোন মনস্বী ব্যক্তির ধারণা যে অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যেরূপ স্বায়ত্ত শাসন উপভোগ করিতেছে, সেরূপ স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতেও, ভারতের এখনও বহুবর্ষ লাগিবে। ভারত এতই অর্থহীন হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ভারত আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। ইংরাজগণের আগমনের পূর্ব্বে ভারতের লক্ষ লক্ষ কুটীরে চরকার সাহায্যে সূত্র প্রস্তুত হইত এবং তাঁতের সাহায্যে পরিধেয় বস্ত্র বয়ন করা হইত। ভারতবাসী কৃষিকার্য্যের দ্বারা যে সামান্য আয় লাভ করিত, তাহাতে বয়ন শিল্পের আয়টুকু যোগ দিলেই, ভারতের এক প্রকার স্বচ্ছন্দেই দিনপাত হইত। এই বয়ন শিল্প যাহা ভারতের অস্তিত্বের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে সকল ভারতবাসী নগরে বাস করেন, তাঁহারা জানেন না, কিরূপে ভারতের জনগণ অর্দ্ধভুক্ত থাকিয়া ধীরে ধীরে জীবনী শক্তিটুকু হারাইতেছে। নগরবাসিগণ জানেন না যে তাঁহারা যে তুচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যটুকু উপভোগ করেন, তাহা তাঁহারা বিদেশীয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির

কর্ম্মে সহায়তা করিয়া দালালি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ঐ দালালি ও লভ্যটুকু ভারতের জন-সাধারণের নিকট হইতেই শোষণ করিয়া লওয়া হয়। পল্লী গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখিলে, বহু পল্লীতেই কঙ্কাল-সার মানবগুলি নেত্র-পথে পতিত হয়। তাহাদের কঙ্কাল-সার দেহগুলি যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহা কূট তর্ক দ্বারা বা আয় ব্যয়ের অঙ্কপাতে ভেল্কি লাগাইয়া কোনক্রমে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমি সুনিশ্চিত বলিতে পারি, ভগবান যদি থাকেন, তবে মানবত্ব এবং বিশ্ব-মানবের বিরুদ্ধে এই যে মহাপাপ সংঘটিত হইয়াছে, যে পাপের তুলনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই পাপের জন্য ভারতের নগরবাসিগণকে ও ইংলণ্ডকে—উভয়কেই একদিন অবশ্যই কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।...পঞ্জাবে সামরিক আইন অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল, আমি পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে শতকরা ৯৫ জন দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড আদৌ বিধি-সঙ্গত হয় নাই। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অপরাধে যে সকল ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে, আমার ধারণা তাহাদের অধিকাংশই নির্দ্দোষ। তাহাদের একমাত্র অপরাধ এই, তাহারা দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল·

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, যে সকল ইংরাজ ও ভারতবাসী শাসন-কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা আদৌ বোঝেন না যে আমি এইমাত্র যে পাপের বর্ণনা করিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সেই পাপের সহিতই সংলিপ্ত আছেন। সত্যই তাঁহাদের সরল বিশ্বাস যে তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারেই ভারতের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারা সরল ভাবেই বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতির ফলে, ধীরে ধীরে হইলেও, ভারত ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারা

বোঝেন না যে বর্ত্তমান পদ্ধতিতে সামরিক-শক্তির ব্যবস্থা-বদ্ধ আড়ম্বরের ফলে ভারতের নর-নারী ভীতি-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রচলিত পদ্ধতি, অতি সূক্ষ্মভাবে হইলেও ফলদায়করূপে ভারতীয়গণের মনে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবাসী নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে, এবং তাহার ফলে কপটতা অভ্যাস করিয়াছে। ভারতবাসী এক্ষণে মনের প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিতে সাহস করে না,—এবং প্রকৃত অবস্থার বিষয় গোপন করিয়া, বাহ্যিক সন্তোষ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবাসীর এই কদর্য্য অভ্যাসের ফলে, শাসক সম্প্রদায় দেশের প্রকৃত অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, এবং তজ্জন্য সমধিক আত্ম-প্রবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

আমি দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছি। এই ধারা অনুসারে, কেহ হিংসা বা উপদ্রবের সৃষ্টি না করিলেও, কেবলমাত্র মনের অসন্তোষ প্রচার করিলেই, অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আমার মনে হয়, ইহা ঠিক নহে। কারণ আইনের সাহায্যে সন্তোষ কখন সৃষ্টি করা যায় না বা তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় না।...যাহাই হউক, আমি জানি, আমি এবং ব্যাঙ্কার মহাশয় যে ধারাতে অভিযুক্ত হইয়াছি সেই ধারা অনুসারে ভারতের কতিপয় প্রিয়তম স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই জন্য আমি ১২৪ ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া গৌরব অনুভব করিতেছি। যে কারণে আমার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, আমি তাহা সংক্ষেপেই বিবৃত করিলাম। তবে এস্থলে ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, কোন শাসকের প্রতি ব্যক্তিগত-ভাবে আমার কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই। সম্রাট মহোদয়ের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ-ভাব থাকিতেই পারে না। কিন্তু যে শাসন প্রণালীর ফলে ভারতবর্ষের মোটের উপর ক্ষতিই সাধিত হইয়াছে, সেই শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ

করাই আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, সত্য সত্যই আমার বিশ্বাস, আমি অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া ইংলণ্ড ও ভারত, উভয়েরই উপকার সাধন করিয়াছি; কারণ আমার ধারণা, এই উভয় দেশই এক্ষণে যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে, সেই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় অসহযোগের পূর্ণ অনুষ্ঠান। আমার মতে, সাধুতার সহিত সহযোগ যেমন কর্ত্তব্য, অসাধুতার সহিত অসহযোগও সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অসহযোগ অনিষ্টকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে হিংসার সৃষ্টি করিয়াছিল। হিংসা করা অনুচিত। আমি আমার দেশবাসিগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি যে হিংসার সৃষ্টি করিলে, মন্দের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠান কখন হিংসা বা উপদ্রবের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয় না; সুতরাং অমঙ্গলের প্রতিষ্ঠানকে দুর্ব্বল এবং সহায়-শূন্য করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে হিংসাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। অহিংস-নীতিতে ইহা বুঝাইয়া দেয় যে অসহযোগ করায় যে দণ্ড প্রযুক্ত হইতে পারে,সেই দণ্ড স্বেচ্ছায় ও আনন্দে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি সেই জন্য কঠোরতম দণ্ড যাহা আমার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবার জন্যই এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বর্ণনা পত্র পাঠ করিবার পর, মাননীয় জজ মহোদয় মহাত্মাকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন :—

গান্ধী মহাশয়! আপনি অপরাধ স্বীকার করিয়া এক পক্ষে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনেকটা সহজ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ আপনার উপর ন্যায়-সঙ্গত কি পরিমাণ দণ্ড প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করাও অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। এই দেশের

বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণকে অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু আপনার উপর উচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন দায়িত্ব। আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান। আইন কখন পদ-মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্য-বিচ্যুত হয় না। কিন্তু তথাপি ইহা মনে না করা অসম্ভব, যে আমি এ পর্য্যন্ত যত লোকের বিচার করিয়াছি বা ভবিষ্যতে আমাকে যাহাদের বিচার করিতে হইতে পারে, সেই সকল ব্যক্তিগণ হইতেই আপনি ভিন্ন শ্রেণীর লোক। ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে আপনার কোটি কোটি দেশ-বাসীর চক্ষে আপনি একজন প্রধান স্বদেশ-হিতৈষী জন-নায়ক। এমন কি যে সকল ব্যক্তি আপনার রাজনৈতিক মতের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও আপনাকে উচ্চ আদর্শের পুরুষ বলিয়া এবং আপনার জীবনকে মহাপুরুষের জীবন বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় আপনিও প্রচলিত আইন সম্মান করিতে বাধ্য; এই হিসাবেই আপনার সম্বন্ধে সমালোচনা করা বা বিচার করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে এবং সেরূপ করিবার আমার ক্ষমতা নাই। আপনার স্বীকার অনুসারেই আপনি আইন অমান্য করিয়াছেন, এবং সাধারণ মানবের চক্ষে যে অপরাধ রাজার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, আপনি সেইরূপ গুরুতর অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন। অবশ্য আমি ভুলি নাই যে আপনি দৃঢ়তার সহিত হিংসা এবং বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনি অনেক ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আপনি সাধারণকে যেরূপ রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে, এবং যে সকল ব্যক্তির সমক্ষে আপনি সেই শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির সাধারণ প্রকৃতির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে আপনার

শিক্ষার ফলে দেশ মধ্যে হিংসা সম্ভূত উপদ্রবের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। আপনি যে ইহার অন্যথা কিরূপে ভাবিয়াছিলেন, তাহা আমার বুদ্ধিতে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আপনি এরূপভাবে কার্য্য করিয়াছেন যে কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই আপনাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া সম্ভবপর নহে, এবং ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি এই কারণে আন্তরিক দুঃখিত নহেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। আপনার সমগ্র জীবনের কার্য্যাবলী সহানুভূতির সহিত আলোচনা করিয়া কেবলমাত্র জন সাধারণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনাকে কি পরিমাণ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে, আমি তাহাই স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান মোকদ্দমার মতই আর একটি মোকদ্দমাতে যে পরিমাণ দণ্ড বিধান করা হইয়াছিল, আমি সেই পরিমাণ দণ্ড প্রয়োগ করিতে মনন করিয়াছি. আমি বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের মোকদ্দমার কথা মনে করিতেছি। তিনিও এই ধারা অনুসারেই অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিনাশ্রমে ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমার মনে হয় আমি যদি আপনাকে তিলক মহাশয়ের সহিত সমশ্রেণীতে সংরক্ষিত করি তাহা হইলে আপনি তাহা অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করিবেন না। আপনার উপর প্রত্যেক অপরাধের জন্য বিনাশ্রমে দুই বৎসর হিসাবে সর্ব্বসমেত ছয় বৎসরের কারাদণ্ড বিধান করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। তবে ইহা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি যে, যদি ভারতবর্ষের অবস্থার গতি পরিবর্ত্তন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হয়, এবং সেই কারণে আপনি যদি ছয় বৎসর অতীত না হইতেই মুক্তিলাভ করেন, তবে সকলের অপেক্ষা আমিই অধিক আনন্দিত হইব।”

তৎপরে মাননীয় জজ মহোদয় আসামী ব্যাঙ্কার মহাশয়ের উপর এক বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের এবং এক সহস্র টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করেন। মহাত্মা গান্ধী জজ্ মহোদয়ের উত্তর দিবার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কথা আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলেন :——

"আমার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনি স্বর্গীয় লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের বিচার কার্য্যের উল্লেখ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য আমি দুই একটি কথা মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি। আমি বলিতে চাই যে তিলক মহোদয়ের নামের সহিত উল্লিখিত হওয়া আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবজনক অধিকার ও সম্মান বলিয়া মনে করি। আপনি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে ইহা অপেক্ষা কম দণ্ড আমাকে কোন বিচারকেই দিতে পারিতেন না। এবং সমস্ত বিচার কার্য্যটি যেভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে বাধ্য যে আপনি আমাদের প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক সৌজন্য আশা করা যাইতে পারে না।*

তৎপরে মহাত্মাজী ও ব্যাঙ্কার মহাশয় হাস্য-মুখে জনগণের নিকট বিদায় লইয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে কারাগারে গমন করিয়া ছিলেন। কারাগারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে গান্ধীজি আর একবার দেশবাসীকে সকাতরে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র চরকাতেই ভারতে স্বরাজ আসিবে। "যদি আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, তবে ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে চরকার প্রতিষ্ঠা করুন। চরকাতেই ভারতের মুক্তি। আপনারা দয়া করিয়া চরকাতে মনোনিবেশ করিলে, আমি কারাগারের মধ্যে থাকিয়াও বিমল-সুখ অনুভব করিব।"

---

* মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির পর "ফরওয়ার্ড" নামক ইংরাজি সংবাদ পত্রে ইং ১৯২৪ ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গান্ধী ভারতের শক্তি-সম্পন্ন নেতা। তাঁহার নিঃস্বার্থ-পরতা ও সত্যপ্রিয়তা প্রত্যেক মানব-হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। এই জন্যই তাঁহার অঙ্গুলি সঞ্চালনে সমগ্র ভারত পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর, ভারতে উপযুক্ত অসহযোগী নেতার অভাব হওয়ায়, ভারতবাসী ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে অহিংস নীতিতে অবিশ্বাসী এবং চরকার শক্তিমত্তায় সন্দিহান হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহাত্মাজীর পবিত্র সংস্পর্শে যে সকল শক্তিমান পুরুষের হৃদয়ে সত্যের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের অনেকেরই হৃদয়, গান্ধীজির অনুপস্থিতিতে, আবার মোহের তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। কংগ্রেস-নেতাগণের মধ্যে প্রবল মত-ভেদ ও অনৈক্য উপস্থিত হইল। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার নীতি অবলম্বন করিলেন এবং মহাত্মাজীর উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নব-প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল সমূহে, সভাসদ-রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। অধিকাংশ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি কাউন্সিলের কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায়, দেশে চরকার প্রচার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল এবং অল্পদিনের মধ্যেই, কার্য্যতঃ চরকার বিলোপ সাধিত হইল। বাংলার মনস্বী ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সময় পূর্ব্ব বঙ্গে চরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম না করিলে, হয় ত এতদিন বাংলার হৃদয় হইতে মহাত্মার স্মৃতিটি পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইত। হায় রে দেশ! তুমিই না সেদিন গান্ধীজিকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছিলে? তিনি না তোমার জন্যই জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আজীবন দুঃখকে চির-সহচর করিয়াছেন? আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশের একটি সংবাদপত্র

ঠিকই বুঝিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন যে অকৃতজ্ঞতার জন্যই ভারতের এত দুর্দ্দশা! অবশ্য গান্ধীজি কৃতজ্ঞতা পাইবার আশায় দেশের সেবা করেন নাই। স্বার্থের ছায়া পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে কখন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেশকে মনে রাখিতে হইবে, কৃতজ্ঞতা ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ মঙ্গল সাধন করে, কৃতজ্ঞতা জাতীয় জীবনেও সেইরূপ শক্তির সঞ্চার করে। কৃতজ্ঞতা স্বরাজ হইতেও সুন্দর, স্বরাজ হইতেও মূল্যবান। কৃতজ্ঞতা না থাকলে কোন জাতি ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভ করিতে পারে না, এবং ঈশ্বরের কৃপা না পাইলে, কোন জাতি কখন প্রকৃত স্বরাজ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অকৃতজ্ঞ ও দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি আকস্মিক কারণে স্বরাজ প্রাপ্ত হইলেও, সে স্বরাজ ক্ষণ-স্থায়ী হয়, এবং পরিণামে সে স্বরাজ জাতির ধ্বংসেরই কারণ হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পরমেশ্বরের কৃপায়, মহাত্মাজী ছয় বৎসর অতীত না হইতেই, কারামুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় বাইশ মাস কারাবাসের পর ইং ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মুক্তিতে সমগ্র জগৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল।

মহাত্মার ন্যায় উদার-স্বভাব ব্যক্তি জগতে অত্যন্ত বিরল। কারাবাস কালে তিনি কখন ভ্রমেও দেশ-কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। ভারতবাসী তাঁহার অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিলে, তিনি মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেন যে তিনি বেশ আরামে আছেন, এবং কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কারাবাসের শেষভাগে সহসা একদিন জানিতে পারা গেল যে তিনি জীবন-সংশয় পীড়াতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার উদরের মধ্যে একটি সংযোজক নাড়ীর উপর একটি স্ফোটক হইয়াছিল। এই স্ফোটকের তীব্র যন্ত্রণা মহাত্মাজী ধীরভাবে সহ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া গবর্ণমেন্টও দুঃখিত ও ভীত হইয়া পড়েন। গবর্ণমেণ্টের আদেশে সত্বর তাঁহাকে কারাগৃহ হইতে অপসৃত করিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে উৎকৃষ্ট হাঁসপাতালে সুবিখ্যাত সার্জ্জেন ও চিকিৎসক মহানুভব ম্যাডক সাহেবের চিকিৎসাধীনে তাহাকে সংরক্ষিত করা হয়। প্রশস্ত-মনা ম্যাডক তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভক্তি গান্ধীজিকে দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গান্ধীজির সেবা করিতেন। গান্ধীজির প্রতি এরূপ আন্তরিক স্নেহ ও ভক্তি না থাকিলে, ম্যাডক সাহেব কখনই গান্ধীজির প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। ম্যাডক মহোদয়ের এই মনুষ্যত্বের জন্য সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

ম্যাডক সাহেব মহাত্মাজীর লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার উদরের মধ্যে অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। ম্যাডক সাহেবের অসাধারণ নিপুণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মহাত্মাজী অতি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আরোগ্য হইবার পর, চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে গান্ধীজিকে কিছুকাল সমুদ্রতটে বাস করিতে হইয়াছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

মহাত্মাজী নিরাময় হইবার পর পুনরায় চরকার উপর তাঁহার অবিচলিত ভক্তির বিষয় দেশ-বাসীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে ধ্বনিত করিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র চরকাতেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বরাজ্য-দলের নেতাগণের কাউন্সিল প্রবেশের নীতি তিনি প্রথমতঃ সমর্থন করেন নাই। ইহাতে স্বরাজ্যীয়গণ প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য গুজরাট প্রদেশে নিখিল

ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাতে বহুসংখ্যক নেতা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৬০।৭০ জন স্বরাজ্য-দলের প্রতিনিধি ছিলেন। মহাত্মাজী এই সভাতে চরকার অনুশীলন সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন যে প্রত্যেক কংগ্রেস-কর্ম্মচারীকে মাসিক স্বহস্তে অন্ততঃ দশ তোলা সূত্র কাটিয়া কংগ্রেস আফিসে পাঠাইতে হইবে। তিনি এই প্রস্তাবের সমর্থনের বক্তৃতা প্রদান করিবার কালে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ স্বরাজ্য-নেতাগণ এতদূর চঞ্চল হইয়া পড়েন যে তাঁহারা মহাত্মার বক্তৃতা শেষ না হইতেই, অধীরভাবে সদল-বলে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মহাত্মাজী ধীরভাবে তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া বলেন যে যদিও স্বরাজ্যীয়গণ সভাতে এক্ষণে উপস্থিত নাই, তথাপি তাঁহাদের ভোটগুলি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গণনা করিয়া ফলাফল বিচার করিতে হইবে।

তাঁহার নির্দ্দেশ মত স্বরাজ্যীয়গণের প্রায় ৭০টি ভোট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গণনা করা হইল। কিন্তু তথাপি সভাতে যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের ভোট গ্রহণ করার পর, গণনায় দেখা গেল যে মহাত্মাজীর প্রস্তাবেরই জয় হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মাজী এইরূপ জয়লাভে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, দেশের এতগুলি বিশিষ্ট নেতা যখন তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধী, তখন তাঁহার প্রস্তাব জয়-যুক্ত হইলেও, তিনি তাহা প্রবল রাখিতে চাহেন না। মহাত্মাজী স্বরাজ্য-নেতাগণের সহিত এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটি মহাত্মার উদারতা, এবং নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিকতার অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গান্ধী কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। চরকার প্রতি অনাস্থা, অহিংস নীতির উপর অবিশ্বাস এবং বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে প্রবল বিরোধ দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছিল। পবিত্র-প্রাণ গান্ধী নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিলেন। দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রাণের বেদনা জানাইলেন। পরম পিতার নিকট হইতে আলোক পাইবার আশায় মহাত্মাজী একবিংশ দিবসের জন্য কঠোর অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে স্বার্থত্যাগী নেতা আলিভাইয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া তিনি এই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। উন্নত-মনা মহম্মদ আলি মহোদয় মহাত্মাকে পরম স্নেহের সহিত যত্ন করিয়াছিলেন। মহাত্মার এই ব্রতের কথা শুনিয়া সমগ্র ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু ভারত কেন, সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং মহাত্মার সংবাদ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল। যাঁহারা মহাত্মাজীর দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের বিষয় জানিতেন, তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন হয় ত এই কঠোর ব্রতের ফলে মহাত্মাজী প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। ভারতের সর্ব্বত্র জনসাধারণ সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া মহাত্মাকে কাতরভাবে ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময় মহম্মদ আলি মহোদয় দিল্লীতে 'একতা সমিতি' আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমিতিতে সর্ব্ব-জাতির ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী নেতাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। সমবেত নেতৃবৃন্দ মহাত্মাজীর

সকাশে গমন করিয়া অনশন ব্রত ভঙ্গ করিবার পক্ষে বিনয়ের সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মার প্রতিজ্ঞা অচল, অটল। দেশ ধ্বংসের অভিমুখে প্রধাবিত। গান্ধীজি মর্ম্মাহত। দেশের এমন অবস্থা হইয়াছে যে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ম কোন উপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব। কর্ম্মবীর গান্ধী কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার সুযোগ পাইলেন না। প্রতি পাদক্ষেপে তিনি বাধা অনুভব করিলেন। তবে কি তিনি কর্ম্মহীন অবস্থায় থাকিয়া দেশের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিবেন? কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। গান্ধীজি স্থির করিয়াছিলেন কঠোর ব্রত অবলম্বনে তিনি করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে প্রাণের কথা নিবেদন করিবেন, এবং করুণাময়ের অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, তিনি অনায়াসে ব্রত সমাধা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন এবং কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেশের দুরবস্থা দূর করিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে বৃথা জীবন ধারণে ফল কি? দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ গান্ধী কিছুতেই ব্রত ভঙ্গ করিলেন না। একবিংশতি দিবস তিনি শরীর রক্ষার উপযোগী কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন নাই। সময়ে সময়ে সামান্য লবণ ও জল মাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এরূপ দৃঢ় ব্রত ব্যক্তির ঈশ্বরোপাসনা কখনও বিফল হয় না। মহাত্মার করুণ প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পহুঁছিয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

মহাত্মা এক্ষণে ঈশ্বর প্রেরিত শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া পুনরায় দেশের শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি ভারতের সর্ব্বস্থান পরিদর্শন করিতেছেন এবং দেশবাসিগণকে পরম উৎসাহের সহিত চরকার মধুর-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের গত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনীতির চর্চ্চায় অধিক সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা গঠন-মূলক কার্য্যের অনুষ্ঠানই

শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রাজনীতি বিষয়ে স্বরাজ্যদলের সহিত তিনি একমত না হইলেও, স্বরাজ্যীয়গণের দেশ-প্রীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যদলকে তিনি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের উপরেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক-বিভাগের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

মহাত্মাজী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি বঙ্গের প্রত্যেক জিলা গমন করিয়া তাঁহার পবিত্র বাণী প্রচার করিতেছেন। বঙ্গদেশ আজ পুণ্যময় আলোকে সমুদ্ভাসিত। মহাত্মাকে দর্শন করিয়া বঙ্গের প্রত্যেক নর নারী আজ প্রাণের মধ্যে এক নবীন স্পন্দন অনুভব করিতেছে। মহাত্মা যথায় গমন করিতেছেন, লক্ষ লক্ষ নর নারী তথায় একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতেছে। বঙ্গে যেন একটা নূতন ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

ধন্য মহাত্মাজী! ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি!! সমগ্র বঙ্গ তন্ময়-চিত্তে আজ মহাত্মার সাফল্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সম্পূর্ণ

উপসংহার।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে। একতাবদ্ধ হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেশের দুঃখ ও দৈন্য দূর করিবার জন্য সকলে কৃত-সংকল্প। ইহা জাতীয় জীবনের একটি শুভ লক্ষণ। এক্ষণে কিরূপ পদ্ধতিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিন্তা করিবার বিষয়। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত নেতাগণ কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতানৈক্য অমঙ্গলের সূচনা করে না, পরন্তু তাহা একটি নব-জাগরণের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রত্যেক মানবেরই নিজ বিবেক অনুসারে কার্য্য করিবার অধিকার আছে, এবং সে অধিকার কোন কারণেই সঙ্কুচিত করা কর্ত্তব্য নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেরূপ নীতিতে সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ পরিচালিত হইয়া থাকেন, সেরূপ নীতির অনুশীলন ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নহে; স্মরণ রাখিতে হইবে, ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, ভারত পরাধীন। নেতা যতই মনস্বী ও শক্তি-শালী হউন না কেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতার বিলোপ সাধন শুভ-প্রদ হইবে না।

যেরূপভাবেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক, লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন তাহা জাতীয় উদ্দেশ্যের বিরোধী না হয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যে কর্ম্ম বিধি-সঙ্গত, সময়োচিত, এবং উপদ্রব-হীন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণা-সম্ভূত কর্ম্ম বৈধ নহে। একথা নেতৃ-বৃন্দ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। দুর্ব্বল জাতি হিংসা-যুক্ত অবৈধ কর্ম্মের আশ্রয় লইলে, অধিকতর শক্তি-হীন হইয়া পড়ে, এবং অবস্থার বৈগুণ্যে তাহার উন্নতির আশা বহুকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিলে, ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এস্থলে সর্ব্ব সাধারণের বিবেচনার জন্য জাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের একটি কল্পনার বিষয় লিখিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে সকল সমিতি বা প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের কোন স্থায়ী সম্পত্তি বা বাৎসরিক আয় নাই। সময়ে সময়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা 'চাঁদা' সংগৃহীত হয় সত্য, এবং তাহা দেশের মঙ্গল-জনক আন্দোলনে ব্যয়িত হয়, সত্য, কিন্তু দেশের দরিদ্র সাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সে অর্থের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। তাহার ফলেই, জন সাধারণ নেতৃ বৃন্দের নিকট হইতে এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায়ই ভারতের কোন না কোন প্রদেশ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বা বন্যা-প্লাবিত হইয়া থাকে। তখন নেতা ক্লিষ্ট জন-গণের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। দুঃখের বিষয় উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই প্রপীড়িত স্থান সমূহের অধিবাসিগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?

ত্রিশ কোটি মানবের আবাস ভূমি এই দেশ। এই দেশের মানব সাধারণতঃ স্বার্থ-ত্যাগী। প্রতি বৎসর জন সাধারণ নেতার ইঙ্গিতে দেশের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা 'চাঁদা' দিয়া থাকেন। এদেশে

কি এমন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যায় না, যে প্রতিষ্ঠানের প্রচুর পরিমাণে স্থায়ী সম্পত্তি থাকিবে এবং সেই সম্পত্তি হইতে বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা আয় উৎপন্ন হইবে? এরূপ প্রতিষ্ঠান থাকিলে, প্রত্যেক বিপৎপাতে দেশবাসীকে 'চাঁদা' সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। বিপৎপাত হইবা মাত্র প্রতিষ্ঠান হইতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং অর্থ দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ, প্রতিষ্ঠানের আয় হইতে সর্ব্ব সময়েই জাতীয় কমিটি দেশের মঙ্গল-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপোষক বলিয়া, ইহা জাতীয় স্বার্থেরও বিশেষ উন্নতি সাধন করিবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের ফলে ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে অবশ্যই একতা সম্পাদিত হইবে। এইরূপ কর্ম্মের অনুশীলনে, প্রকৃত স্বরাজেরই সাধনা করা হইবে।

বাঁকুড়াতে এইরূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতির নাম হইয়াছে 'জাতীয় স্বাবলম্বন সমিতি'।

যে সকল জিলাতে স্বল্প মূল্যে পতিত ভূমি পাওয়া যায়, এই সমিতি তথায় প্রচুর পরিমাণ ভু-সম্পত্তি অর্জ্জন করিবে। পতিত ভূমির সংস্কার সাধন করিয়া, সমিতি তাহাতে তুলা ও অন্যান্য শস্যের চাষ করিবে। সমিতির ভূমির উপর কতকগুলি কুটীর নির্ম্মিত হইবে এবং তাহাতে প্রধানতঃ চরকা ও তাঁতের প্রতিষ্ঠা হইবে। সমিতির প্রস্তুত খদ্দর সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। জিলা সমিতি সুবিধামত দেশের কল্যাণার্থে অন্যান্য ব্যবসায়েরও পরিচালনা করিতে পারিবেন। সমিতির উৎপন্ন শস্য, খদ্দর এবং ব্যবসায়—উৎপন্ন অর্থ 'স্বাবলম্বন' প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বার্ষিক আয় বলিয়া গণ্য হইবে। এই 'স্বাবলম্বন' সম্পত্তি ও আয়ে ভারতের

প্রত্যেক নর-নারীর তুল্য স্বার্থ থাকিবে কিন্তু সমিতির প্রত্যেক নির্দ্ধারণ সভ্যগণের অধিকাংশের মতানুযায়ী সম্পাদিত হইবে।

স্বাবলম্বন সমিতি নিজ অর্জ্জিত আয় হইতে এবং নিজ চেষ্টায় যে সকল সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক, তাহার আভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) সর্ব্ব শ্রেণীর মানব প্রয়োজনমত যাহাতে উপযুক্ত কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা।

(খ) প্রচুর পরিমাণে তুলার চাষ ও চরকার প্রতিষ্ঠা।

(গ) গো-জাতির উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার প্রচার। গো-জাতির রক্ষার জন্য সর্ব্বত্র গো-গৃহ প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) ভারতের লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার এবং নব নব শিল্পের প্রতিষ্ঠা।

(ঙ) অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রচার।

(চ) পল্লীগ্রাম সমূহে স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান।

(ছ) সমাজ কর্ত্তৃক ঘৃণিত জাতি সমূহের প্রতি প্রকৃষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন; তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করণ।

বক্তৃতা দ্বারা ও মুদ্রিত পুস্তিকা বিতরণ দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র স্বাবলম্বন সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করা হইবে। ভারতবর্ষে যতগুলি জিলা আছে, তাহার শতকরা ৭৫টী জিলাতে স্বাবলম্বন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে, এবং প্রত্যেক সমিতি যথেষ্ট সম্পত্তি ও বার্ষিক আয় অর্জ্জন করিতে পারিলে, সকল সমিতিগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তখন তাহাদের সমষ্টির নাম হইবে 'ভারতীয় স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠান।"

জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায়, স্বাবলম্বন সমিতি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। তবে এই সমিতির কার্য্য দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন হইবে। এই সমিতি বর্ত্তমান কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের

বিরোধী নহে। অথচ ইহা কংগ্রেস বা ভারতের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সহায়ক। ভারতের উন্নতির জন্যই এই সমিতি জাতীয় শিল্পের উদ্ধার করিবে, কোন জাতি বা দেশ-বিশেষের অনিষ্ট সাধকের উদ্দেশ্যে নহে।

স্বাবলম্বন সমিতির কার্য্য পরিচালনে, ভারতের অন্য কোন সমিতির হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। এবং এই সমিতি কোন কারণে অন্য কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারিবে না।

স্বাবলম্বন সমিতির উপযোগিতা চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা কোন সময় বিশেষের সমিতি নহে। এমন কি, ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, এই সমিতির অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। কারণ এই সমিতি ভারতের সর্ব্বাবস্থাতে কর্ত্তৃপক্ষকে সুসংযত রাখিতে সক্ষম হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে এই সমিতি শ্রমজীবিগণের এবং সাধারণের নিজ গৃহ স্বরূপ।

প্রত্যেক জিলাতে এক লক্ষ সভ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমিতির কার্য্য অতি সত্বর ফল-প্রসূ হইবে। প্রত্যেক সভ্যের বার্ষিক সাহায্য চারি আনার অধিক কোন ক্রমেই উচিত নহে। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যদি দেশের জন্য নিয়মিতরূপে অতি সামান্য পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করেন, তবে সেই স্বার্থত্যাগের সমষ্টির উপর উন্নতির একটি বিরাট সৌধ অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অপরিমিত স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা সার্ব্বজনীন নিয়মিত স্বার্থত্যাগ ভারতের পক্ষে অধিক কল্যাণপ্রদ।

পরমেশ্বরের কৃপায় ভারতের মঙ্গল হউক।